ক্যামেলিয়া

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০[illegible]৩

CAMELIA

BY

NIHARRANJAN GUPTA

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৭০

প্রকাশক ॥ সমীরকুমার নাথ ॥ নাথ পাবলিশিং ॥ ২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস ॥

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট ॥ গৌতম রায়

মুদ্রাকর ॥ সুব্রত প্রিন্টিং ওয়ার্কস ॥ ৫১ ঝামাপুকুর লেন ॥ কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রীমান প্রবীরকুমার মজুমদার
পরম কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

ভেনডেটা

সূর্যমহল

ক্যামেলিয়া।

বন্ধুবর ডাঃ তরুণ ঘোষ নামটা আবার পুনরুচ্চারণ করে ক্যামেলিয়া।

প্রশ্ন করলাম, ওর নাম ক্যামেলিয়া?

হ্যাঁ—সে ওকে ক্যামেলিয়া বলেই ডাকত।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধু বলে আবার, খুব আশ্চর্য লাগছে, না কবি?

না—আশ্চর্য নয়—

তবে?

মনের মধ্যে তখন ভেসে উঠছে কবিগুরুর সেই লাইন কটা:

> জিগেস করলাম, 'নামটা কী।'
> সে বললে, 'ক্যামেলিয়া।'
> চমক লাগল—

বললাম, মনে আছে ডাক্তার?

কি? তরুণ শুধায়।

ছাত্র জীবনের সেই তোর কবিতাটার কথা?

কবিতা! কোন কবিতা?

সেই যে প্রায়ই তুই আবৃত্তি করতিস?

> জিগেস করলাম, 'নামটা কী।'
> সে বললে, 'ক্যামেলিয়া।'
> চমক লাগল—

সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বলে ওঠে,

> আর একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে

দুজনে এবারে শেষটুকু এক সঙ্গেই বলে উঠি:

> হেসে বললেন, 'ক্যামেলিয়া,
> সহজে বুঝি এর মন মেলে না?'

বললাম, আশ্চর্য নামটাত ?

হ্যাঁ—ওকে যে ছেলেটি ভালবাসত সেই ওকে ক্যামেলিয়া নামে ডাকত।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ—আসলে কিন্তু ওর নাম হচ্ছে মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী !

হ্যাঁ—

পাগলা গারদের ডাক্তার বন্ধু তরুণ ঘোষ।...তরুণের সঙ্গে সকাল বেলা পাগল গারদটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

একটি নির্জন কটেজে তাকে দেখলাম !

কটেজের ঘরে খোলা জানালার শিক ধরে ও দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স কত হবে কে জানে—চোখ মুখ দেখে ধরবার উপায় নেই।

তা ছাড়া মাথার অজস্র এলানো কেশ একেবারে সাদা। পেকে সব নাকি রাতারাতি সাদা হয়ে গিয়েছিল।

সুদূরে নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি—সমগ্র মুখখানি জুড়ে কি এক করুণ বিষণ্ণতা।...

তরুণ সামনে গিয়ে দাঁড়াল, কেমন আছেন ?

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল তরুণের দিকে নিঃশব্দে। কোন সাড়া দেয় না।

এবারে তরুণ আরো একটু সামনে এগিয়ে যায়। আবার শুধায়, কেমন আছেন ?

ভাল না—

কেন ?

কানে কিছু শুনতে পাচ্ছি না—চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—

পাবেন—দেখতেও পাবেন, শুনতেও পাবেন।

পাব না। পার্থকে আবার দেখতে পাবো—তার ডাক আবার শুনতে পাবো—তাই কি হয়—

পাবেন বৈকি—

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বলে, পাবো—পাবো বৈকি—সামনের ঐ পাহাড়টা—জানি ঐ পাহাড়টা কোনমতে ডিঙুতে পারলেই তার দেখা পাবো—

আচ্ছা যুদ্ধ—যুদ্ধ থেমে গিয়েছে না?

হ্যাঁ—

আর চীনেরা—যারা জোর করে আমাদের সীমানার মধ্যে এসে হানা দিয়েছিল তাদের সব পণ্ডিতজী ফাঁসী দিয়ে দিয়েছেন না?

হ্যাঁ—সবার ফাঁসী হয়ে গিয়েছে—কিন্তু ঘরের টেবিলের 'পরে সব খাবার আপনার পড়ে আছে, খান নি কেন?

সে কথার কোন জবাব দিল না মেয়েটি। হঠাৎ সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে শক্ত করে দুহাতে জানালার গরাদটা চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে ডাক্তারকে শুধায়, আচ্ছা ডক্টর—ক্যামেলিয়াকে চেনেন—তার—তার নিশ্চয়ই ফাঁসী হয়ে গিয়েছে না—

ক্যামেলিয়া!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—she was a spy—গুপ্তচর—she has been shot dead—নিশ্চয়ই তাকে গুলি করে মেরেছে ফায়ারিং স্কোয়াড্—উঃ কি প্রচণ্ড সে শব্দ—বলতে বলতে দু হাত দিয়ে কান ঢেকে ধরে—সমস্ত মুখে অসহ্য যন্ত্রণার একটা চিহ্ন ফুটে ওঠে…দুটো চোখ বুজে যায়—সারা শরীর মেয়েটির কাঁপতে থাকে।

থর থর করে কাঁপতে থাকে।

আমাকে তরুণ চোখের ইংগিত করে—দুজনে তাড়াতাড়ি সরে আসি।

ফিরবার পথে শুধাই, মেয়েটির কি হয়েছে রে?

বলবো খন!…বলে তরুণ—very sad! অত্যন্ত করুণ কাহিনী।…

কি বলছিল যেন spy?

হ্যাঁ—she was a spy।

বলিস কি!

তাই—

সেই রাত্রে সবে আমরা ডাক্তারের হাসপাতালের কোয়ার্টারের ড্রয়িংরুমে মৌজ করে বসেছি—হাসপাতাল থেকে জরুরী কল বুক এলো—১১ নং কেবিনের রোগীটির অবস্থা নাকি খুব খারাপ—এক্ষুনি যেতে হবে—

উঠতে উঠতে এবং জামাটা গায়ে দিতে দিতে তরুণ বলে, একেই বলে অন্যের দাসত্ব—চল যাবি নাকি

চল—

একা একা আর বসে থেকে কি করব—উঠে দাঁড়ালাম।

হাসপাতালে গিয়ে রোগীটিকে দেখবার পর দুজনে বাংলোর দিকে ফিরছি—সেই কটেজটা সামনে পড়ল।

থমকে দাঁড়ালাম।

কটেজের বারান্দায় হাতে একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি নিয়ে সেই চাঁদের না বুড়ির মত সাদা চুল মেয়েটি ধীর পদে এগিয়ে চলেছে।

মুখে মোমবাতির আলো পড়ে মৃদু মৃদু কাঁপছে।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে বন্ধুটি শুধায়, কি হলো—

দেখ তোর সেই মেয়েটি না!

হ্যাঁ—

হাতে মোমবাতি—

অন্ধকার রাতে অমনি করে প্রজ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কেন!

চল—বাংলোয় চল—

ফিরে এলাম দুজনে বাংলোয়।

রাত বেশী নয় মাত্র সোয়া আটটা।

দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ভৃত্যকে তরুণ ফিরে এলো। দুজনে মুখোমুখি দুটো সোফায় বসলাম।

রাঁচী শহরে ডিসেম্বরের হাড় কাঁপান শীত।

ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেস জ্বলছে বটে কিন্তু তাতেও শীত যেন মানায় না।

ভৃত্য এসে কফি দিয়ে গেল—ধূমায়িত দুকাপ কফি।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে ডাক্তার শুরু করে—কাহিনী আমার শোনা ঐ মেয়েটিরই এক বান্ধবীর কাছ থেকে—আর মিলিটারী রিপোর্ট থেকে যা জেনেছি তাই বলবো,—মেয়েটির ইতিহাস সত্যিই বড় করুণ—এইভাবে দিনের পর দিন জীবনমৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার চাইতে সেদিন যদি মেয়েটার মৃত্যু হতো—তারপরই একটু থেমে বলে, জানিস মেয়েটির বয়স ২৭।২৮য়ের বেশী নয়—

বলিস কি!

হ্যাঁ—আর ঐ যে ওর মাথায় ঢেউ খেলানো চুল—সব রাতারাতি পেকে নাকি সাদা হয়ে গিয়েছিল—

রাতারাতি!

হ্যাঁ—মেয়েটির নাম মীনাক্ষী কিন্তু যে ওকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল সে ওকে আদর করে যে নামে ডাকত আজো সেই নামটুকুই ও তাকেই কেবল ওর মনে আছে, বাকী সব বোধহয় মন থেকে মুছে গিয়েছে—

কি সে নাম?

ক্যামেলিয়া—

॥ ১ ॥

অত পা টিপে টিপে আসতে হবে না—টের পেয়ে গিয়েছি তুমি এসেছো—

না ফিরে এবং দরজার দিকে না তাকিয়েই কথাগুলো মৃদু হেসে বলে পার্থপ্রতীম। এবং সত্যিই পা টিপে টিপে অতি সন্তর্পণে যে মেয়েটি ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ভিতরে পা ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে যায়।

ওষ্ঠে মৃদু হাসির বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে মেয়েটির।

কিন্তু তার আগে, আবার পার্থপ্রতীমই বলে, ইলেকট্রিক ষ্টোভে বিরজু চায়ের জলটা চাপিয়ে রেখে গিয়েছে, সুইচটা অন্ করে দিয়ে এসো মীনা—চায়ের পিপাসাটা সত্যিই প্রবল হয়ে উঠেছে—

মীনা কিন্তু পাশের ঘরে যায় না বরং এগিয়ে আসে সামনের দিকে এবং এগিয়ে আসতে আসতে বলে, কিন্তু এটা ত তোমার চা খাবার সময় নয় পার্থ—ফলের রস খাওয়ার সময়—

ইজিচেয়ারের উপর শুয়ে শুয়ে কথা বলছিল পার্থপ্রতীম।

ছোট মাঝারী আকারের ঘরটি—ঘরের এক পাশে সিঙ্গল বেডে একটি এলোমেলো শয্যা।

মেঝেতে বিছানো একটি ফরাস—তার চাদরটা বহু ব্যবহারে মলিন। ফরাসের উপর হারমোনিয়াম—ডুগি তবলা, একটি এস্রাজ।

এক কোণে একটি রেডিও ও গ্রামোফন। তার পাশে টেবিল ও চেয়ার।

দেওয়ালে একটি আলনায় কিছু জামা-কাপড়।

পার্থর বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে। শীর্ণ চেহারা। লম্বাটে গড়ন।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো। গায়ের রঙ কালো।

প্রশস্ত ললাট—কিন্তু কেমন যেন ক্লিষ্ট পাণ্ডুর। খাড়া নাক—ধারালো চিবুক।

চশমার কাচের ভিতর দিয়ে চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক একটা দীপ্তিতে যেন চক্‌চক্‌ করছে। মুখে দু'দিনের না কামান দাড়ি।

পরিধানে ঢোলা পায়জামা ও গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবী—পাঞ্জাবীর একটি বোতামও নেই—সব ছিঁড়ে গিয়েছে।

কোলের উপর একটা খাতা—তার এক পাতায় গান লেখা—অন্য পাতায় স্বরলিপি— এবং স্বরলিপির মধ্যে অজস্র কাঁটাকাটি।

মীনার এক হাতে ঠোঙ্গায় ফল ও অন্য হাতে কালো রংয়ের প্ল্যাষ্টিকের একটা হ্যাণ্ডব্যাগ।

মীনার বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে।

গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, দোহারা গড়ন।

চোখে-মুখে একটা আলগা শ্রী আছে—আর দেহের যৌবন সুষমা যেন টলমল করছে ভাদ্রের ভরা দীঘির মত।

চোখে-মুখে প্রসাধনের খুব হালকা একটা প্রলেপ।

পরিধানে কালো পাড় শাদা মিলের শাড়ি—গায়ে সাধারণ একটা ক্যালিকো মিলের রঙিন ব্লাউজ।

হাতের ব্যাগ ও ঠোঙ্গাটা টেবিলের ওপরে রেখে এগিয়ে এলো মীনা পার্থর পাশে : কেমন আছো—আজ জ্বর আসেনি ত ?

মৃদু শান্ত হাসি হাসে পার্থ।

কথাটা বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে মীনা পার্থর কপালের 'পরে চ্যুত রুক্ষ পশমের মত নরম চুলগুলো তুলে দিতে দিতে কথাটা শেষ করে, নাঃ কপাল ত ঠাণ্ডাই মনে হচ্ছে—

পার্থ যেন সে কথায় কানই দেয় না।

আপন মনেই যেন অন্য কথা বলে, কিন্তু গানটার সুর কিছুতেই যেন খুঁজে পাচ্ছি না—চিরদিন পরের গানে সুর দিয়ে এলাম—

তোমার লেখা প্রথম গান অথচ কিছুতেই সে গানের সুর খুঁজে পাচ্ছি না – মীনু—

পার্থর মাথার রুক্ষ চুলগুলো সরু সরু আঙ্গুল দিয়ে সস্নেহে বিলি করতে করতে মীনাক্ষী বলে, পাবে—ব্যস্ত হচ্ছো কেন! ও যখন আসবার ঠিক আসবে। সময় হলেই ঠিক আসবে—সারাটা দুপুর বুঝি ঐ করেছো?

সে কথার জবাব দেয় না পার্থ—অন্য কথা বলে: আজ তোমাব আসতে দেরি হয়েছে মীনু—কখন দিনের আলো নিভে গিয়েছে টেব পাইনি। জানালাটা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কখন উঠেছে জ্বলজ্বলে একটি তারা —সেই সন্ধ্যাতারাটির দিকে চেয়ে আছি হঠাৎ যেন মনের মধ্যে একটা সুর গুনগুনিয়ে উঠলো। গুন গুন করে সুরটাকে ধরবার চেষ্টা করচি—কিন্তু আসতে আসতেও যেন এলো না। পালিয়ে গেল। হারিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে—

কি?

মৃদুকণ্ঠে শুধায় মীনাক্ষী।

জানালা পথে যে সন্ধ্যাতারাটি এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো একক—অনন্য—সলজ্জকোমল—দেখি সেই তারাটি আর একক নেই, তার আশেপাশে আরো তারা কখন দেখা দিয়েছে একটি দুটি করে।

আমি তোমার ফলের রসটা করে নিয়ে আসি—

দাঁড়াও—দাঁড়াও শোন—

কী?

সেই মুহূর্তে তোমার একটি নাম আমার মনে পড়ল

আমার নাম!

হ্যাঁ—নতুন একটা নাম।

কি নাম?

বলত কি নাম?

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে। পার্থ বলে, পারলে না‍ত—জানি পারবে না—এসো সামনে এসো কানে কানে বলি।

দাঁড়াও ফলের রসটা আগে করে নিয়ে আসি তারপর শুনব।

না—না—আগে শোন।

ধরে ফেলে পার্থ মীনাক্ষীর একটা হাত—শোন, কানে কানে বলে—ফিসফিস্ করে—ক্যামেলিয়া—

কি ?

ক্যামেলিয়া। আজ থেকে—এই মুহূর্ত থেকে ঐ নামেই তোমাকে আমি ডাকব—

মীনাক্ষী হাসে।

হাসছো !

পাগল—

সে যাই বলো, আজ থেকে তুমি আমার ক্যামেলিয়া।

মীনা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

একটি মাঝারী সাইজের ও অন্যটি ছোট একটি ঘর। দোতলার ’পরে ঐ তুটি ঘর নিয়ে থাকে পার্থপ্রতীম—প্রায় বছর খানেক আছে।

পুবের দিকে রাস্তা এবং উত্তরে ছোট একটি খোলা ছাতের মত আছে। সেখানে কিন্তু ফুলের টবে নানা ফুল গাছ। ছাতের প্রাচীরের উপর দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় একটা পার্ক।

মীনাই পুতেছে ঐ গাছগুলো টবে।

এই তু-কামরাওয়ালা ছোট ফ্ল্যাটটা তু’জনে মিলে অনেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিল। বিয়ে করে তু’জনে ঘর বাঁধবে বলে।

ছোট একটি নিরালা সুখের গৃহকোণ রচনা করতে চেয়েছিল তু’জনে কিন্তু আকস্মিক ঝড়ের একটা নিষ্ঠুর ঝাপটায় যেন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল।

নিভে গেল ঘরের বাতিটা যেন।

পার্থপ্রতীম চৌধুরী—গানে সুর দেয়—গান গায়। ছোটবেলা থেকে করে এসেচে সুরের সাধনা।

ছোটবেলায় মা-বাপ মারা গিয়েছে।

এক দূব সম্পর্কীয় কাকার কাছে মানুষ। কাকার কাছেই ছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন কাকা নোটিশ দিল।

বাড়িতে লোকজন বেড়ে গিয়েছে: অর্থাৎ কাকার এক শ্যালক হঠাৎ দেশ থেকে চাকরির সন্ধানে কলকাতায় এসে উপস্থিত—অতএব সিঁড়ির পাশে ছোট যে ঘরটা অধিকার করে গত একুশ বছর ছিল পার্থপ্রতীম, সেটা ছেড়ে দিয়ে আসতে হলো।

অবিশ্যি ছেড়ে দেবে ঘরটা শীঘ্র মনে মনে কল্পনাই ছিল কিন্তু সে ছাড়া যে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হবে সেইটে সে ভাবতে পারে নি যেন সেদিন:

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'জনে কিছুদিন ধরেই এদিকে ওদিকে ঘর খুঁজছিল কিন্তু হঠাৎ নোটিশটা এসে পড়ল: অবিলম্বে ঘর ছাড়তে হবে।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পার্কে দেখা হতো দু'জনার মধ্যে।

পার্থ সেখানে গিয়ে বেঞ্চিটার উপর বসে অপেক্ষা করত—মীনাক্ষী আসত অফিস ফেরত।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন চারিদিক অস্পষ্ট।

পার্কের আলোগুলো জ্বলে ওঠে।

বেঞ্চটার পিছনেই একটা পাম গাছ। সন্ধ্যার মৃদুমন্দ বাতাসে তার পাতাগুলো সির সির্ শিপ্ শিপ্ শব্দ করে।

দূর থেকে দেখা যায় মীনাক্ষীকে।

কালো প্ল্যাষ্টিকের ব্যাগটা হাতে নিয়ে আসচে সে।

অফিসে চাকরি করে মীনাক্ষী। বিরাট মার্চেন্ট অফিস।

আশ্চর্য! কী অদ্ভুত মিল দুজনার জীবনের। সেও জীবনের প্রথম দিকেই পার্থর মত নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল এবং এক মাসীর কাছে মানুষ। তবে পার্থর কাকার মত সে তাকে পথ দেখায় নি।

লেখাপড়া শিখিয়েছে এবং বিয়ে দেওয়ারও একটা ইচ্ছে ছিল ভদ্রমহিলার কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠে নি।

কাজেই মীনা একটা চাকরি খুঁজে নিয়েছিল।

দু'জনার আলাপের ব্যাপারটাও বিচিত্র।

প্রখ্যাতনামা শিল্পী পার্থপ্রতীমের গানের একজন বিশেষ ভক্ত ছিল মীনাক্ষী।

অত্যন্ত খেয়ালী শিল্পী পার্থপ্রতীম—দেড় বছর ও দু'বছরে একখানার বেশী কখন গান রেকর্ড করেনি—রেডিওতে বহুবার ডেকেছে কিন্তু গায় নি।

বলেছে, আমার গান আমার একান্ত নিজস্ব—আমার নিজের মনের খুশি—নিজের মনের আনন্দ—হাটে বাজারে দশজনার মধ্যে বিকোবার জন্য ত নয়।

অথচ তেমন করে চাহিদানুযায়ী গাইলে হয়ত কত টাকাই রোজগার করতে পারত পার্থ।

কাগজে পার্থপ্রতীমের ছবি দেখেছে মীনা এবং রেকর্ডে গান শুনেছে কিন্তু সামনা-সামনি চাক্ষুস কখন দেখেনি তাকে এবং কখনো সামনা-সামনি শোনেনি তার গান ও।

অনেকদিনকার একটা গোপন বাসনা ছিল মনের মধ্যে মীনার সে সামনা-সামনি পার্থকে দেখে—তার গান শোনে।

কিন্তু সে দুর্লভ সুযোগ আর আসেনি জীবনে। ভেবেছিল বুঝি আসবে না কোনদিনই কিন্তু আকস্মিকই এলো সে সুযোগ একদিন জীবনে।

হঠাৎ একদিন বান্ধবী শীলা এসে বললে কথায় কথায়, ওরে তোর সেই রূপকথার দেশের গায়ক পার্থপ্রতীম যে সামনের শনিবার সন্ধ্যায় রবীনদার বাড়িতে আসছে—রবীনদার জন্মদিন—ওর বন্ধু ত—গাইবে।

সত্যি—আনন্দে যেন ছল্‌কে ওঠে মীনাক্ষী।

সত্যি—

আমি যাবো। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে।

তাইত বললাম তোকে—

কিন্তু তোর—, সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে যায় মীনাক্ষী।

কি ?—

তোর রবীনদাকে ত আমি চিনি না ভাই—সেখানে তাঁর জন্মদিনের উৎসবে যাওয়াটা কি—হঠাৎ যেন মীনাক্ষী থেমে যায়।

তাতে কি, আর উৎসব মানে তো কোন বড় লোকের বাড়ির উৎসবের মত হৈ চৈ ব্যাপার একটা কিছু নয় রে। ছোট একটি ঘরোয়া মিলন—দু-চারজন একান্ত আপনার মানুষ আসবে ঐ দিনটিতে শুভকামনা জানাতে—

তবু মীনার যেন সংকোচ যায় না।

শীলার রবীনদাকে দেখেছে বটে ইতিপূর্বে কয়েকবার মীনাক্ষী দূর থেকে কিন্তু পরিচয় ত নেই। যার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই তার জন্মদিনে—

কিন্তু সে সংকোচটা আর রইলো না মীনাক্ষীর। বৃহস্পতিবার অফিস থেকে ফিরে ছোট একটা চিঠি ডাকে পেয়ে।

সুচরিতাসু,

শনিবার ১২ই আমার জন্মদিন—আপনি যদি আসেন খুশি হবো। এবং আরো খুশি হবো যদি ঐদিন একটি গান গেয়ে শোনান। ইতি

রবীন চক্রবর্ত্তী।

॥ ২ ॥

ফলের রসটা একটা কাচের গ্লাসে করে নিয়ে মীনাক্ষী এসে ঘরে ঢুকল।

সামনের খোলা জানালা পথে ছোট্ট একটুকরো আকাশ চোখে পড়ে।

সন্ধ্যা রাতের আকাশে সেই সন্ধ্যা তারাটি তখন দেখা দিয়েছে। ভীরু মিটি মিটি।

অন্যমনে খাতাটা কোলের উপর রেখে সেই তারাটির দিকেই তাকিয়ে ইজিচেয়ারটার 'পরে গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল পার্থ-প্রতীম।

মীনাক্ষী সামনে এসে দাঁড়াল, নাও ফলের রসটা খেয়ে নাও—

কিন্তু—পার্থ ফিরে তাকাল মীনাক্ষীর মুখের দিকে, আমি চেয়েছিলাম এক কাপ চা—

এখন আর চা নয়, এই ফলের রসটুকু খেয়ে নাও, ধর। বলতে বলতে গ্লাসটা এগিয়ে ধরে একেবারে মুখের কাছে মীনাক্ষী পার্থর।

বেশ দাও, গ্লাসটা হাতে নিয়ে এক চুমুক রসটুকু খেল পার্থ, তারপর বলে কিন্তু ক্যামেলিয়া—এ রীতিমত আমার পৌরুষের অপমান—

সে আবার কি!

নয়—এই যে ঘরের মধ্যে দিনের পর দিন পক্ষকাটা বিহঙ্গের মত আমায় রেখে দিয়েছো—

সে আবার কি?

নয়—এই যে অকর্মণ্যতা—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিষ্ক্রিয়তা—পরমুখাপেক্ষীতা···

তা ডাঃ সর্বাধিকারী যে তোমায় বলেছেন Complete rest নিতে—

Rest—rest আর complete rest কিন্তু এ ভাবে বেঁচে লাভ কি বলতে পার ক্যামেলিয়া—

সত্যি—সত্যি—মীনাক্ষী পার্থর কথাটা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, এবার থেকে ঐ নামেই আমাকে ডাকবে নাকি তুমি!

হ্যাঁ—তাই।

কিন্তু এ কি বিচিত্র খেয়াল তোমার!

খেয়াল্ কিনা জানি না তবে তুমি সত্যিই আমার মনের নিভৃতে একটি সুদুর্লভা ক্যামেলিয়া ফুল—

কিন্তু তাত নয়—হঠাৎ মৃদু হেসে বলে ওঠে মীনাক্ষী, ক্যামেলিয়া ত সত্যি সত্যিই নয়—নাম তার ছিল কমলা—

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে, মনে নেই তার পরের কথাগুলো তোমার—

হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া',
সহজে বুঝি এর মন মেলে না?'

তনুকা কী বুঝলে জানি নে—হঠাৎ লজ্জা পেলে, খুশিও হল॥

একটু বোস পার্থ, বলে, আমি জানি তুমিও খুশি হবে—খুশি যে তোমাকে হতেই হবে।

মৃদু কৌতুক হাসি মীনাক্ষীর চোখে মুখে কিন্তু সেদিকে তাকায়ও না পার্থ—হাত বাড়িয়ে কেবল মীনাক্ষীর হাতটা নিজের হাতের মুঠটার মধ্যে ধরে—এবং আরো মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলে।

নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হরতুকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলের পিঠের উপরে।

বাসাবাড়ি কোথাও নেই—
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ
কেবল ছিল সেই ক্যামেলিয়া॥

কেন যেন সহসা মীনাক্ষীর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে—নিঃশব্দে নিজের হাতটা পার্থর মুঠো থেকে ছাড়িয়ে সামনের অন্ধকার ছাতের পরে এসে দাঁড়ায়।

সব মনে পড়ে—সেই পার্থ।

চিঠিটা পেয়ে মীনাক্ষীও প্রথমে অবাক। বুঝতেই পারে না চিঠিটার মাথামুণ্ডু কিছু। তারপর অবিশ্যি শীলার সঙ্গে দেখা হতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

শীলাই প্রথমে প্রশ্ন করে, কিরে এবারে যাবি ত?

ও—তোর কীর্তি তাহলে—

তা কি করি—

ছিঃ ছিঃ কি ভাবলেন বলত তোর রবীনদা—

কিছু ভাবেনি—যাক আসছিস ত?

দেখি—

দেখি নয় সুনিশ্চিত। আসবি—

প্রথমে ভেবেছিল ও যাবে না তারপর কি ভেবে শনিবার সন্ধ্যায় কয়েক গোছা রজনীগন্ধা ও রবীন্দ্রনাথের একটি 'জন্মদিন' নিয়ে কুণ্ঠিত পায়ে গিয়ে হাজির হলো রবীনের গৃহে।

কালীঘাট অঞ্চলে একটা সরু গলির মধ্যে অনেক কালের পুরানো একতলা একটা বাড়ি।

গলির মধ্যে যে গ্যাস বাতিটা জ্বলছে তার আলো এত সামান্য যে যতদূর দৃষ্টি চলে সরু গলিপথটার মধ্যে একটা আলোছায়ার

লুকোচুরি চলেছে যেন, বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই কানে এলো তার প্রিয় গায়কের গলার গান।

পার্থপ্রতীমের গান।

পার্থপ্রতীম গাইছে :

কোন্ ভিখারি হায় রে এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব ধন মন মম মাগিল রে ॥

দরজাটা সামান্য খোলা—ভিতর থেকে আলোর আভাস দেখা যায়। একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে মীনাক্ষী।

পার্থ গায় : হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।

আজি মম অন্তর-মাঝে সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙ্গিল রে ॥

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে যেন পা টিপে টিপে দরজাটা আলতো ভাবে ঠেলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল মীনাক্ষী।

ছোট ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতা। মাঝখানে ছোট একটি জয়পুরী ভাসে কিছু পদ্মকলি ও রজনীগন্ধা, ধূপাধারে মল্লিকা ধূপ জ্বলছে--ফুলের গন্ধের সঙ্গে সেই মল্লিকা ধূপের গন্ধ যেন মেশামেশি হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ঘরের মধ্যে বেশী লোকজন নেই। এক পাশে বসে রবীন যার জন্মদিন—আর তার দুটি বন্ধু—তাদের মীনাক্ষী আগে কখন দেখেনি আর আছে তার বান্ধবী শীলা ও শীলারই সমবয়সী একটি মেয়ে।

পরে জেনেছিল মীনাক্ষী সে রুবী—রবীনের বোন।

মাঝখানে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে পার্থপ্রতীম।

এই সামনা-সামনি এবং এত কাছে প্রথম দেখল পার্থপ্রতীমকে মীনাক্ষী। পরনে পায়জামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবী।

মাথার চুল রুক্ষ।

প্রশস্ত ললাট--ললাটের 'পরে কয়েক গাছি চূর্ণ কুন্তল।

গান সবে শেষ হয়েছে—মীনাও ঘরে পা দিয়েছে, শীলাই তাড়াতাড়ি দেখতে পেয়ে সাদর আহ্বান জানায়, এই যে মীনা আয়—রবীনদা—মীনাক্ষী—

রবীনও হাত তুলে নমস্কার জানায়—আসুন, আসুন—

মীনাক্ষী সকলকে নমস্কার জানিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছ বাড়িয়ে দেয় রবীনের দিকে, রবীন হাত পেতে নেয় ফুল ও বইটা, তারপর মৃদু স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে, নিলাম দু'হাত পেতে মীনাক্ষী দেবী কিন্তু একটি গান—

পার্থপ্রতীম চোখ তুলে তাকায় মীনাক্ষীর দিকে।

দু'জনে চোখাচোখি হয়।

শীলা বলছিল আপনি নাকি চমৎকার গান গান, কিন্তু বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন—আবার আহ্বান জানায় রবীন।

শীলাও বলে, আয় বোস—মীনা—

মীনাক্ষীকে বসতেই হয় এবং বসে বলে, শীলা আপনাকে যাই বলে থাকুক তার সবটুকু অকপট সত্য নয় কিন্তু—কারণ, আমার গান আর যেখানেই গাই না কেন এ আমার—বিশেষ করে একটু আগে যে গান শুনতে শুনতে পথের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তারপর আর এখানে নিশ্চয়ই জানবেন সে গান শোনাবার মত ত নয়ই—শোনবার মতও নয়—

হঠাৎ যেন মুখ দিয়ে কথাগুলো বের হয়ে গিয়েছিল মীনাক্ষীর। এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হচ্ছে তার কথার জবাব দিয়েছিল সেদিন পার্থপ্রতীম।

বলেছিল, যারা গান গায়—তাদের গান শোনবার মত ও শোনাবার মত হবে না তাই কি কখন হয় নাকি—নিন—গান একটা গান—বলতে বলতে হারমোনিয়ামটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল পার্থপ্রতীম।

ঠিক—ঠিক বলেছো পার্থ—সায় দেয় রবীন।

॥ ৩ ॥

পাশের ঘরে পার্থর জন্য ফলের রস ছাঁকতে ছাঁকতে সেই প্রথম দিনের কথাটাই যেন কেন মনে পড়ছিল মীনাক্ষীর।

কত দিন—প্রায় দু'বছর হতে চলল।

সেদিন সন্ধ্যায় রবীনদার বাসাতেই প্রথম দু'জনার আলাপ—পার্থরই গাওয়া—তারই সুরের একটি গানের ভিতর দিয়ে।

আর সে গানটির রচয়িতা ঐ রবীন চক্রবর্তী।

পার্থ হারমোনিয়ামটা এগিয়ে দেবার পরও ও ইতস্ততঃ করছিল—তখন পার্থই আবার তাগিদ দেয়, কই—গান—

ভাল লাগবে না কিন্তু—

লাগবে, গান।

মীনাক্ষী তখন গেয়েছিল :

একটি সন্ধ্যাতারা
সেদিন সন্ধ্যা রাতে—
আমার গানের প্রথম কলি
সুরের একতারাতে।

মীনা কোন দিন কারো কাছে গান শেখেনি—সাধনাও কিছু তার ছিল না। গাইত সে আপন খেয়াল-খুশিতে। কিন্তু সেদিন সেই সন্ধ্যা রাত্রির আসরে তার কণ্ঠ যেন পরম এক বিস্ময়ের মত সুর বিস্তার করেছিল।

সুরে যেন আপনা হতেই ময়ূরের মত সাত রঙা প্যাখম মেলেছিল।

গান থেমে যাবার পরও যেন সুর আর গানের কথাগুলো ঘরের মধ্যে গুনগুনিয়ে ফেরে, কারো মুখে কোন কথা নেই।

কেবল নির্বাক একটি আনন্দের সুর যেন সবার মনকে স্পর্শ করে রয়েছে তখন। আশ্চর্য।

আর কোন দিন তেমন করে গাইতে পারেনি মীনা।

সে গান আর আসেনি তার গলায়।

কিন্তু না আসুক সেই দিন যা সে গেয়েছিল সে যে তার চিন্তার অতীত।

ফেরার সময় রবীনই তার বন্ধু পার্থকে অনুরোধ করে, রাত অনেক হয়ে গিয়েছে—পার্থ তুই মীনাক্ষী দেবীকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাস—

নিশ্চয়ই যাবো—

পার্থ বলে।

রাত যে হয়েছিল মিথ্যে নয়।

একটার পর একটা গান—ওদের যেন সেদিন গানের নেশায় পেয়েছিল। গান গাওয়া ও শোনার শেষই হয় না যেন।

আসর যখন ভাঙ্গল রাত তখন সোয়া এগারটা।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেরুতে বেরুতে রাত পৌনে বারটা হয়ে যায়।

দু'জনে বেরুল।

গলিপথটা পার হয়ে বড় রাস্তা।

কিন্তু অত রাত্রে তখন বড় রাস্তাটাও প্রায় নির্জন। এক আধটা পানের দোকান ছাড়া সব বন্ধ।

বাস ট্রাম সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে—কেবল একটা আধটা রিকশার ক্লান্ত ঘন্টির আওয়াজ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঠুং ঠুং ঠুং।

আপনার বাসা ত সেই শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে বললেন না? পার্থ শুধায়।

হ্যাঁ—জবাব দেয় মীনাক্ষী।

একটা রিকশা নিই—

কি দরকার—এটুকু পথ হেঁটেই যেতে পারব—

পার্থ আর কথা বাড়ায় না। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলে।

আকাশে মেঘ করেছে। বেশ ঘন মেঘ।

শ্রাবণের শেষ—শহরে বর্ষাটা ঝিমিয়ে এসেছে বটে কিন্তু এখনো একেবারে থামেনি।

দূরে বোধহয় কোথাও বৃষ্টি হয়েছে: একটা ঝিরঝিরে জলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

পার্থকে যেতে হবে সেই মীর্জাপুর।

পাশাপাশি দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক সময় পার্থ বলে, এত সুন্দর আপনার গলা—এত সুন্দর আপনি গান অথচ আপনি গাইতে চাইছিলেন না—

বিশ্বাস করুন ব্যাপারটা আমার কাছেও সত্যিই আকস্মিক। মীনাক্ষী সংকোচভরা কণ্ঠে বলে।

আকস্মিক!

হ্যাঁ—তাছাড়া আরো একটা কথা কি জানেন?

কি?

সামনা-সামনি আপনার গান শুনবো আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সুযোগ হয় না—

কেন?

কেন কি? আপনি ত সহজে কোথায়ও গান না—তাই শীলা যখন এসে বলল আপনি রবীনবাবুর জন্মদিনে আসছেন—গান গাইবেন—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো—

কি—

রবীনবাবুকে ত আমি চিনি না—তাঁর জন্মদিনে কেমন করে তাহলে আমার যাওয়া হয়—

তারপর?

তারপর আর কি? শীলা বোধহয় বলেছিল রবীনবাবুকে, তিনি যাবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেন। তাই বলছিলাম গান গাইতে ত নয়—আপনার গান শোনবার জন্যই যে আমার যাওয়া—আপনারই ফুল দিয়ে আপনাকে প্রণাম জানালাম। তারপরই

একটু থেমে বলে, আচ্ছা একটা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন না ?

না, না—রাগ করবো কেন ?

আপনি এত কম রেকর্ড করেন কেন ? বেতারেও গান না—

ভাল লাগে না—

আশ্চর্য ! কেন ?

কারণ ও আমার নিজস্ব আনন্দের জিনিষ বলে—

কিন্তু আমরা যে চাই আপনার গান।

আছে ত রেকর্ড—

সমুদ্রের পিপাসা কি এক গণ্ডুষ জলে মেটে—

এবার পূজোয় একটা রেকর্ড করছি—

সত্যি ! কি গান ?

রবীনের লেখা গান। জানেন—আমি যেমন খুব কম গান গাই—রবীনও তেমনি কদাচিৎ কখন গান লেখে। আজ পর্যন্ত গত চার-পাঁচ বছরে ও মাত্র চারটি গান লিখেছে।

আলাপের সূত্রপাত দু'জনার মধ্যে ঐদিন থেকেই।

ঐদিন সন্ধ্যার পর দিন দুই বাদে আর এক সন্ধ্যায়। অফিস থেকে ফিরছে মীনাক্ষী পায়ে হেঁটে।

রাস্তার ধারে ফুটপাতের উপরে একটা পুরাতন বইয়ের দোকান, দোকান ঠিক নয়—একটা লোক রাস্তার ধারে ফুটপাতের 'পরে বহু পুরাতন বই ছড়িয়ে নিয়ে বসে বিক্রী করছে।

সেখান দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মীনাক্ষীর নজরে পড়ল, পার্থ একটা বহু পুরাতন জীর্ণ বই হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে উল্টে উল্টে দেখছে।

পার্থকে এখানে দেখে মীনাই আগ্রহে এগিয়ে যায়, পার্থ বাবু—

কে ! ও আপনি !

পুরানো বই দেখছেন বুঝি ?

হ্যাঁ—সঙ্গীত শাস্ত্রের উপর একটা পুরানো বই—rare এব অত্যন্ত মূল্যবান বই—কিন্তু আপনি এদিকে এ সময়ে—

রোজ অফিস থেকে ত এই রাস্তা ধরেই আমি বাড়ি ফিরি—

পার্থ তখন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে, কত নেবে বইটা।

সাত টাকা বাবু—

পার্থ দ্বিরুক্তি করে না। পকেট থেকে টাকা বের করে বইটা নিয়ে নেয়—তারপর মীনাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, চলুন—

মীনাক্ষী বলে, ও সাত টাকা দাম বললো আর আপনি সাত টাকা দিয়ে দিলেন? দামও করলেন না—

দামী এবং মন যা চায় সে জিনিষের কি দর কষাকষি করে দাম ধার্য করতে হয়—

করতে হয় না বুঝি?

না। তা'হলে আর প্রাপ্তির—দুর্ল্লভের আনন্দটা থাকল কোথায়? তাছাড়া আজ ত আমার পকেট ভর্তি—আজ ত বলতে পারেন আমি রাজা—

রাজা!

হ্যাঁ—নতুন রেকর্ডের—মানে পূজোর যে রেকর্ডটা বেরুচ্ছে তার disc-এর জন্য এক সঙ্গে চারশ টাকা পেয়েছি—

নতুন রেকর্ডটা বাজারে বেরিয়েছে নাকি?

না—এখনো বাজারে বের হয়নি তবে একটা রেকর্ড আমাকে Complementary দিয়েছে—

সত্যি!

হ্যাঁ—শুনবেন?

নিশ্চয়ই—

তাহ'লে যে কষ্ট করে একবার আমার বাড়ি যেতে হবে।

যাবো।

দাঁড়ান—তাহলে একটা ট্যাক্সি ডাকি।

ট্যাক্সিতে করে বাড়ির সামনে গিয়ে নেবে দু'জনে সিঁড়ির তলার সেই প্রায় অন্ধকার ঘরটার মধ্যে ঢোকে।

ঢুকতে গিয়ে পার্থ মীনাক্ষীকে সাবধান করে দেয়, আসুন—দেখবেন মাথা বাঁচিয়ে আসবেন—

পার্থ সেখানেই থাকে বটে তবে সেটাকে ঘর বলা চলে না।

আলো জ্বেলে পার্থ বলে, বসুন।

মীনাক্ষী চৌকীর 'পরে বসে এদিক ওদিক তাকায়।

বাড়িতে কেউ নেই আমি একা। সবাই মানে কাকা তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে তাঁর শালার ছেলের বিয়েতে ভাগলপুর গেছেন।

আপনি এইখানে থাকেন নাকি?

হ্যাঁ—কেন—ও কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন!...কথাটা বলে কয়েকটা মুহূর্ত যেন বিস্ময়ের সঙ্গেই মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে পার্থ। তারপরই হঠাৎ হেসে ফেলে—

হাসলেন যে!

এই ঘরটা দেখেই বোধহয় কথাটা জিজ্ঞেস করলেন—এই ঘরে আমি থাকি কিনা? কিন্তু এতে বিস্ময়ের কি আছে! একটা মানুষের থাকবার জন্য আরো বেশী জায়গার কি সত্যই প্রয়োজন আছে মীনাক্ষী দেবী?

কিন্তু এ যে আলো নেই বাতাস নেই—

আছে—আছে—সব আছে। তাছাড়া কুড়ি বছর এই ঘরটার মধ্যে আমি আছি—

কুড়ি বছর! বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না মীনার।

হ্যাঁ, কুড়ি বছর—কিন্তু যাক, কি খাবেন বলুন—চা আনাই আর গরম গরম সিঙ্গাড়া—

না, না—কিছুর দরকার নেই—

বাঃ তা কি হয়—প্রথম এলেন আপনি আমার ঘরে—

আপনার রেকর্ডটা শুনতে এসেছি, রেকর্ডটা শোনান—

সে ত শোনাবই—কিন্তু আগে একটু চা—তাছাড়া আপনি ত

অফিস থেকে আসছেন—পিপাসা কি আর পায় নি। নিশ্চয় পেয়েছে—

বেশ—শুধু চা—আর কিছু না—

শুধু গান শোনা নয় তারপর সেদিন আরও আলাপ হয়েছিল দু'জনার মধ্যে।

এবং ফিরতে সেই প্রায় রাত নয়টা হয়ে গিয়েছিল মীনাক্ষীর সেদিন রাত্রে।

পথে নেমে পার্থই বলেছিল, আবার কবে দেখা হচ্ছে? কবে বলুন—

কবে?

হ্যাঁ—বলুন কবে?

কাল পরশু—

তাই হবে—এবং মনে থাকে যেন কাল পরশু। অনিশ্চিত নয়—নিশ্চিত কাল—

আগামী কাল—তবে একটা কথা আছে—

বলুন।

এখানে, মানে ঐ ঘরে নয় কিন্তু—

তবে কোথায়?

অন্য কোনখানে। তা সে যেখানেই হোক—

বেশ সামনের ঐ পার্কে—

তাই আসবো।

কখন?

অফিসের পর—কাল সন্ধ্যায়।

হ্যাঁ—আগামী কাল—আমি অপেক্ষা করবো।

॥ ৪ ॥

ঐ পার্কের মধ্যেই সন্ধ্যার পর দু'জনে পাশাপাশি বসে কথা বলে।

পরস্পর পরস্পরকে নিবিড় করে জানতে পারে।

ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে পরস্পরের কাছে পরস্পর ওরা।

সেও কম নয় একটা বছরের ইতিহাস।

ইতিমধ্যে ওরা স্থির করে বিয়েটা করে ফেলা প্রয়োজন। বিয়ে করে ওরা কোথাও নিজেদের ছোট একটা নীড় বাঁধবে।

ছোট একটি নীড়। নিরালা গৃহকোণ।

পার্থ বলে, তা কবে ?

কি কবে ? মীনা দুষ্টুমি ভরা চোখে ওর মুখের দিকে তাকায়।

আমাদের বিয়েটা কবে ?

সে ত যে কোনদিন হতে পারে কিন্তু তার আগে যে একটা বাড়ি চাই—

বাড়ি।

হ্যাঁ—নচেৎ উঠবো কোথায় গিয়ে আমরা ?

সত্যিই ত। কথাটা ত একবারও মনে হয় নি—তাহলে ?

কি তাহলে ? বাড়ি একটা খুঁজে বের করব।

দু'জনে খুঁজতে শুরু করল বাড়ি—এবং প্রায় চার মাস বাদে এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটি পেল—কিন্তু ইতিমধ্যে পার্থর 'পরে ঘর ছাড়ার নোটিশ জারী হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক হলো সামনে দিন চারেক বাদে ইষ্টারের ছুটি আছে, সেই দিনই পার্থ চলে আসবে ফ্ল্যাটে।

এবারে বিয়েটাও সেরে ফেলতে হবে।

রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে দু'জনে নোটিশ দিয়ে এলো।

ইষ্টারের ছুটি এলো।

সকালে পার্থ ফ্ল্যাটে উঠে গেল—সারাটা দিন ধরে দু'জনে ঘর সাজাল। রাত আটটায় মীনা চলে গেল।

বলে গেল কাল খুব ভোরে আসবে। তারপর দু'জনে এক সঙ্গে চা খাবে।

কথামত খুব ভোরে এলো বটে মীনা কিন্তু দু'জনের আর এক সঙ্গে চা খাওয়া হলো না।

ঘরের দরজা বন্ধ।

মীনা ভেবেছিল দরজা খোলাই থাকবে—দরজার গোড়াতেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে পার্থ ওর জন্য।

ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য।

কিন্তু দেখলো দরজা বন্ধ।

বোধহয় এখন ঘুমই ভাঙ্গে নি পার্থর। মৃদু হেসে টোকা দিয়ে ফিস-ফিসিয়ে তখন ডাকে, পার্থ—পার্থ—

সাড়া নেই।

পার্থ—আমি এসেছি—দরজাটা খোল—

এবার দরজা খুলে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে পার্থ।

কিন্তু পার্থর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন চমকে উঠে মীনা।

এ কি চেহারা পার্থর!

রাতারাতি এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন। সমস্ত মুখে যেন কে কালী ঢেলে দিয়েছে।

কোটরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে একরাত্রের মধ্যেই যেন চোখ দুটো—অদ্ভুত দীপ্তিতে যেন ঝক্-ঝক করচে।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো।

সহসা বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে ওঠে মীনার।

পার্থ!

পার্থ চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

কি হয়েচে পার্থ! কি হয়েছে?

পার্থ চুপ, বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তখনো শুধু মীনার মু
দিকে, ওর চোখে চোখ রেখে।

কথা বলছো না কেন? কি হয়েছে—কি হলো? অমন করে
চেয়ে আছো কেন, কথা বলছো না কেন! পার্থ—

মীনা—

বল—

তু—তুমি চলে যাও মীনা—

চলে যাবো!

হ্যাঁ—যাও—এখুনি এখান থেকে চলে যাও—পালিয়ে যাও
এখান থেকে—দূরে—অনেক দূরে—

পালিয়ে যাবো!

হ্যাঁ—হ্যাঁ—

পার্থ—এগিয়ে আসে মীনা বুঝি দু-পা।

হঠাৎ যেন ওর কাছ থেকে ছিট্‌কে দূরে সরে যায় পার্থ, না,
না—এসো না। কাছে এসো না—কাছে এসো না আমার—

পার্থ! কি হয়েছে তোমার পার্থ! অমন করছো কেন?

গলা বুজে আসে মীনার—চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়ে
আসে।

পার্থ কোন জবাব দেয় না। এগিয়ে গিয়ে খাটের নীচ থেকে
গতকাল সংসারের জন্য আবশ্যকীয় কেনা একটা কাচের বাটি এনে
ওর সামনে তুলে ধরে।

বলে, এই দেখ—

এ কি—এ যে রক্ত! একটা আর্তনাদ যেন অস্ফুটে বের হয়ে
আসে মীনার গলা চিরে—একটা চাপা অবরুদ্ধ কান্নার মত।

সত্যিই থক্ থক্ করছে বাটির মধ্যে লাল রক্ত। লাল—জমাট
বেঁধে উঠতে পারেনি তখনো ভাল করে।

কাল—কাল কাসতে কাসতে গলা দিয়ে বের হয়েছে
রক্ত—পার্থ কোন মতে বলে।

কার—কার গলা দিয়ে? তবু জিজ্ঞাসা করে মীনা।

আমার—আমার গলা দিয়ে—কথাটা বলে হাত থেকে কাচের বাটিটা নামিয়ে রাখে পুনর্বার পার্থ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে মীনা ছুটে এসে দু'হাতে পার্থকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, না—না—গো, না, না—

মীনা ছেড়ে দাও—আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও—আমি জানি, এ কি ভয়ানক ব্যাধি—আমার মা—আমার ছোট ভাই এই ব্যাধিতেই মারা গিয়েছিল—

না, না—মীনা তখনো বলে চলেছে আর কাঁদছে পার্থর বুকের মধ্যে মুখটা গুঁজে।

নাগো—না—না—না—

পার্থ বলতে থাকে, আঠার বছর তারপর চলে গিয়েছে, ভেবেছিলাম এ ব্যাধি থেকে আমি বোধহয় মুক্তি পেলাম কিন্তু এখন বুঝতে পারছি মুক্তি আমি পাইনি—আমাকে মুক্তি সে দেয়নি—অলক্ষ্যে আমাকেও গ্রাস করেছে।

না, না—চুপ করো—ওগো লক্ষ্মীটি চুপ কর—আমি বলছি কিছু তোমার হয়নি—চল এক্ষুণি আমরা ডাক্তারের কাছে যাবো।

কোন লাভ হবে না মীনা, আমি বলছি সেই বিষাক্ত বীজাণুই আমার বুকের মধ্যেও বাসা বেঁধেছে—

না,—না, কিছুতেই না। সে হতে পারে না। ভগবান এত বড় নিষ্ঠুর হতে পারেন না—

ভগবান যে কত বড় নিষ্ঠুর তুমি তা জান না মীনা—কিন্তু আমি জানি; আমি যে বার বার দু'বার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তাঁর পরিচয় পেয়েছি—

সেই দিনই সবচাইতে বড় যে ডাক্তার সে শহরে তার চেম্বারে নিয়ে গেল মীনা পার্থকে সঙ্গে করে। ডাঃ সর্বাধিকারী অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন—

কি দেখলেন ডাঃ সর্বাধিকারী—মীনা উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙ্গে পড়ে।

X'ray আর sputum-এর report না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না—বললেন বটে মুখে কথাটা ডাক্তার কিন্তু ষ্টেথো বসিয়েই পার্থর বুকে তিনি টের পেয়েছিলেন ব্যাধি টি, বি, নিঃসন্দেহে এবং ডান দিককার ফুস্‌ফুস্ ভাল ভাবেই জখম করেছে।

কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও ডাঃ সর্বাধিকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা তার কেঁপে ওঠে কেন জানি।

ফিরে আসে দু'জনে ফ্ল্যাটে।

পার্থ বলে, চুপচাপ কেন মীনু—

কই—

মিথ্যেই তুমি স্বপ্ন দেখছো মীনু—আমি জানি—ঐ রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় কি আছে—

ডাক্তার কি তাই বললেন নাকি?

আজ বলেন নি কিন্তু দু'দিন বাদে বলবেন—

তুমি ত সব জেনে বসে আছো—আমি বলছি দেখো কিছু হয়নি তোমার—

॥ ৫ ॥

এই পর্যন্ত বলে তরুণ থামল।

পাশেই সিগ্রেটের টিনটা ও দেয়াশালাই ছিল—টিন থেকে একটা সিগ্রেট বের করে নিয়ে—অগ্নিসংযোগ করল তরুণ।

কয়েকটা টান দিয়ে ধুমোদ্গারণ করে আবার বলতে থাকে, এলোমেলো সব ঘটনা—ছেঁড়া ছেঁড়া—আমিই সব গুছিয়ে জোড়া দিয়ে নিয়েছি—কাজেই সত্যির মধ্যে অনেক কল্পনাও আমার থেকে গিয়েছে কিন্তু কবি—

—থাক—তুই বলে যা।

তাগিদ দিলাম আমি।

—আরো একটা জিনিষ অবিশ্যি আমাকে ওর জীবন কাহিনী জানতে সাহায্য করেছে অনেকটা—

—কি!

—যে সময় ও spying করেছিল—সেই সময় মধ্যে মধ্যে ও ডাইরী রেখেছে—ডাইরী ঠিক নয়—একটা বাঁধান খাতার মধ্যে মধ্যে খেয়াল খুশিতে বোধহয় নিজের কথা লিখত, সেই খাতাটা ওর কলকাতার বাড়ি সার্চ করে পাওয়া গিয়েছিল—সেটা পরে শীলা পুলিশের কাছ থেকে নেয় এবং শীলার কাছে পাই—

—শীলা মানে ওর সেই বান্ধবী—রবীনের বোন!

—হ্যাঁ—বর্তমানে আমার স্ত্রী—

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ—যাক—যা বলেছিলাম—

মিথ্যে সান্ত্বনা।

এ কথা কি চাপা থাকে, না চাপা দেওয়া যায়।

ডাক্তার সর্বাধিকারীকেও সত্য কথাটা বলতে হলো এবং ওদের পরস্পরের কাছেও সত্যটা আর গোপন থাকল না।

সান্ত্বনার পর্দাটা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে সত্য প্রকট হয়ে পড়ল।

মীনা বলে, কিছু তুমি ভেবো না পার্থ—ডাক্তার সর্বাধিকারী ত বললেনই—এ রোগের আজকাল যে সব মোক্ষম ঔষধ বের হয়েছে—এ রোগে আজকাল আর কেউ তাই মরে না—

মৃদু হাসে পার্থ।

আমি তোমাকে ভাল করে তুলব পার্থ। নিশ্চয়ই ভাল করে তুলব—

কিন্তু যে সময় ধৈর্য ও অর্থের প্রয়োজন—

আমি সব জোগাড় করবো—

পার্থ আর কোন কথা বলে না। কোন জবাব দেয় না মীনার কথার। খোলা জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—পার্থ—

—উঁ—

—চুপ করে আছো কেন, কথা বল।

—মীনা—

—বল?

—কবিগুরুর সেই গানটা জান?

—কোন গানটা।

পার্থ গুনগুনিয়ে গায়:

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিনী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়
গহন তিমির গুহাতলে যাই নামি যে॥

মীনাক্ষী শক্ত করে পার্থর হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে।

প্রত্যহ নিয়ম করে আসে মীনা পার্থর ফ্ল্যাটে—তার সেবা করে—তার ঔষধ-পত্রের সব ব্যবস্থা করে।

উৎসাহ দেয়—আশা দেয়।

রাত-দিনের একটা চাকর রেখেছে মীনা—বিরজু।

রাত্রে যাবার আগে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে যায়।

শ্রান্তি নেই ক্লান্তি নেই—সর্বক্ষণ হাসিমুখ মীনাক্ষীর। কিন্তু ওর ঐ সেবা—ওর ঐ হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে পার্থর বুকের মধ্যে যেন কেমন করে।

মনে হয় সে যেন অন্যায় করে মীনাকে লুণ্ঠন করছে। প্রাপ্যর চাইতেও অনেক বেশী যেন জোর করে আদায় করে নিচ্ছে। এ শুধু অন্যায় নয়, অনুচিত।

মীনাকে এমনি করে আটকে রাখবার তার কোন অধিকার নেই।

সেদিন মীনার আসতে একটু দেরিই হয় অফিস থেকে। হাতে ফলের ঠোঙ্গা—বিস্কুট ও মাখন।

ঘরে ঢুকে মীনা থমকে দাঁড়ায়।

ঘর অন্ধকার।

এ কি—আলো জ্বালোনি কেন এখনো—ঘর অন্ধকার। বিরজু কোথায়? বলতে বলতে নিজেই হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দেয়।

চুপটি করে বসেছিল ইজিচেয়ারটার উপরে পার্থ।

অমন করে বসে যে!

মীনা তাকায় পার্থর মুখের দিকে।

সামান্য একটু হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে পার্থর মলিন ওষ্ঠপ্রান্তে।

হরলিক্‌স খেয়েছিলে?

না—

সে কি—বিরজু দেয় নি?

সে দুপুর বেলা ছুটি নিয়ে গিয়েছে, এখনো ফেরেনি—

আশ্চর্য। সেই দুপুরে গেছে এখনো ফেরার নাম নেই—

মীনা তাড়াতাড়ি হরলিক্স্ বানিয়ে নিয়ে আসে। বিস্কুট দেয়, বলে, নাও—

এখন হরলিক্স্ খেতে ভাল লাগছে না মীনু—একটু চা কর। তুমিও খাও—আমাকেও দাও—

সে হবে'খন—হরলিক্সটা ত খেয়ে নাও—

হরলিক্সের কাপটা সামনে নামিয়ে রেখে চা তৈরী করতেই বোধ হয় চলে যায় মীনা পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে দু'কাপ চা দু'হাতে নিয়ে আবার ফিরে এলো ঐ ঘরে মীনা—

চা পান করতে করতেই দু'জনার মধ্যে কথা হয়।

পার্থ ডাকে, মীনু—

মীনা বলে, বল—

এটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না—এ অন্যায়—

কি ঠিক হচ্ছে না—কি অন্যায়!

এমনি করে এখনো কেন তুমি আমার সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে রেখেছো?

পার্থ—

হ্যাঁ—সমস্ত জীবন তোমার সামনে। তুমি বলছিলে না—

কি?

তোমার মাসী তোমার জন্য একজন পাত্র ঠিক করেছেন—তাকেই তুমি বিয়ে কর না কেন?

তুমি খুব খুশি হও তাহলে, না?

হ্যাঁ—খুউব—

সে ত বুঝতেই পারছি।

একটা কথার জবাব দেবে পার্থ?

কি?

ধর আজ যদি তুমি আমি হতাম আর আমি তোমাকে ঐ কথাটা বলতাম—

মীনু—

যে মেয়ে স্বামী বর্তমান থাকতেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাকে তোমরা কি বল নিশ্চয়ই ভুলে যাও নি। আর আমাকে লোকে তাই বলুক নিশ্চয়ই তুমি তা চাও না—

কিন্তু মীনু—বলবার চেষ্টা করে পার্থ: তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না—

বুঝতে পারছি বৈকি—

না—পারছো না। তুমিই বল এভাবে আর কতদিন তুমি চালাবে? আমার যা পুঁজি ছিল সে ত শেষ তলানীতে এসে পৌঁছেছে—

কিন্তু আমার পুঁজি ত আজও তলানীতে এসে পৌঁছায় নি—তাছাড়া সুস্থ সবল শরীর আমার—আরো পাঁচ ঘণ্টা অনায়াসেই আমি খাটতে পারি।

না, না—তা তুমি করো না মীনু। নিজেকে over strain করো না—বেশী কাজ করো না। এমনি ভাবে শুয়ে থাকার যে কি দুঃসহ ক্লেশ তুমি উপলব্ধি করতে পারবে না। বেঁচে থেকেও এই যে নিরুপায়তা—it is worse than death. মৃত্যুর চাইতেও মর্মান্তিক।

কেন তুমি ঐ সব কথা ভাব বলত? ডাঃ সর্বাধিকারী তো বলেছেন—দ্রুত তুমি improve করছো। শীঘ্রই তুমি আগের মত সুস্থ হয়ে উঠবে। আগের জীবনে ফিরে যাবে—

তোমার ডাক্তার যাই বলুন মীনু—আমি জানি তা আর হবার নয়।

ছিঃ, কি এসব তুমি বলছো।

যা সত্যি—তাই বলছি। তুমি যাও—একে ত নিজের অসহায়ত্ব নিজেকে সর্বক্ষণ পীড়ন করছে তার উপরে যখন দেখি নিজের স্বার্থের

জন্য তোমাকে কেবলই জড়িয়ে ফেলছি—নিজেকে কিছুতেই যেন আর আমি ক্ষমা করতে পারি না।

বেশ—আর বাধা দেব না। বল, যত খুশি তোমার বল। আমাকে ব্যথা দিয়ে যদি তুমি আনন্দ পাও—

মীনু—

তাই—তাই দাও—তাই দাও—মীনার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আর শব্দ বের হয় না—কেবল দু'চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে।

কেঁদ না মীনা, কেঁদ না—আমি হাঁপিয়ে উঠেছি—সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো এই তিন মাসে আমি সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি। নইলে তোমাকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো—ক্ষমা করো।

আর কখন—কোন দিন ঐ সব কথা বলবে না বল।

না—

আমাকে ছুঁয়ে বল।

বলব না।

॥ ৬ ॥

পার্থপ্রতীম মিথ্যা বলে নি।

ঐ ভয়াবহ ব্যাধির সঙ্গে এক আধ দিনের ত নয় দীর্ঘ দিনের যে সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রাম করতে হলে সত্যিই অর্থের প্রয়োজন।

পার্থর জমানো টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল মাস তিনেকের মধ্যেই —তারপরই সমস্ত ভার পড়েছিল মীনার উপরে।

সে জন্য অবিশ্যি মীনার কোন দুঃখ ছিল না। হাসিমুখেই সে ভার সে তুলে নিয়েছিল নিজের কাঁধে।

পার্থকে সে কথা সে জানতেও দেয় নি।

কিন্তু গোলযোগ দেখা দিল অন্যদিক দিয়ে। সম্পূর্ণ অতর্কিতে।

মীনাক্ষীর মাসী বিমলা—মীনাকে এক প্রকার নিজের সন্তানের মত করেই মানুষ করেছিল।

অভাবের সংসারে তার নিজের তিনটি সন্তানের সঙ্গে আপন করে নিয়েছিল মীনাক্ষীকেও, মানুষ করেছে—লেখাপড়া শিখিয়েছে তাকে।

বিয়েরও চেষ্টা যা হোক একটা মেয়েটার জন্য করছিল মাসী এবং মেসো দু'জনাই।

কিন্তু হঠাৎ মীনাক্ষী এক মার্চেন্ট অফিসে চাকরি নিল।

মাসীর চাকরির ব্যাপারে খুব ইচ্ছে না থাকলেও বাধা দিল না। মনে মনে ভাবল, যাক—করুক চাকরি যে কটা দিন একটা ভাল পাত্র না খুঁজে পাওয়া যায়।

পাত্রর সন্ধান পেলে দেখা যাবে।

কাজেই পাত্রের সন্ধান পাওয়ায় এবং সেই পাত্র মীনাক্ষীকে পছন্দ করায়—কথাটা একদিন বিমলা তুলল বোনঝির কাছে।

বললে, ছেলেটি ভাল—মা আছে সংসারে আর কেউ নেই—রেলে চাকরি করে—তুই যদি ছেলেকে দেখতে চাস ত—

কোন প্রয়োজন নেই—জবাব দেয় মীনা।

প্রয়োজন নেই!

না।

কেন?

মীনার সঙ্গে তখন পার্থর মাস পাঁচেকের ঘনিষ্ঠতা চলেছে। দু'জনে পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করবে তাও তাদের মধ্যে স্থির হয়ে গিয়েছে।

এখন বিয়ে করবি না ত কবে আর করবি—বয়স কম হলো নাকি তোর? মাসী আবার বলে।

কেন ব্যস্ত হচ্ছো মাসী—সময় যখন হবে তখন আমিই তোমাকে জানাব—

ব্যাপারটা যেন শোকেসের সাজান পুতুল—তুমি বললেই আমি সংগ্রহ করে এনে দেবো—পাগলামি করিস না—মাসী ঝংকার দিয়ে ওঠে।

পাগলামি আমি করছি না—

পাগলামি ছাড়া আর কি এসব? ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না—পাত্রকে তুমি দেখ—আলাপ কর—যদি অপছন্দ হয় ত অন্য কথা, তবে অপছন্দ হবার মতো ছেলে সে নয় আমি বলছি।

মীনাক্ষীকে তখন অনন্যোপায় হয়েই পার্থর কথা জানাতে হয়েছিল। তবে নামটা সে বলে নি।

বলেছিল কেবল, আমি একজনকে কথা দিয়েছি মাসী—আর সেও আমাকে কথা দিয়েছে।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে বোনঝির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বিমলা বলে, কথা দিয়েছো!

হ্যাঁ—

কে সে? কোথায় থাকে—কি করে—

সময় হলেই সব বলবো। জানতে পারবে তখন—

তার মানে?—

তার মানে এখনো সময় হয় নি—

হয়েও যেতো বিয়েটা ইতিমধ্যে কিন্তু সব যে ওলোট-পালোট হয়ে গেল পার্থ অসুস্থ হওয়ায়। শুধু তাই নয় তারপর প্রত্যহ অসুস্থ পার্থর ফ্ল্যাটে অফিসের পর যাওয়া এবং রাত করে প্রত্যহ বাসায় ফেরা—ক্রমেই ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে সবার।

প্রথম প্রথম মুখ ভার—তারপর ছোটখাটো কথায় বিরক্তি প্রকাশ—তারপর ক্রমশঃ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিমলা।

বলে, এসব কি শুরু করেছো?

মীনা জানত এ প্রশ্নের সম্মুখীন তাকে একদিন হতেই হবে। এবং সে জন্য সে প্রস্তুতও ছিল।

বলে, কি শুরু করেছি?

কচি খুকীটি নও তুমি মীনা যে বুঝতে পারছো না আমার কথা—

বিমলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর—থমথমে মুখ।

অফিসের পর কোথায় যাও—

কেন বলত?

না—তাই জিজ্ঞাসা করছি।

আমার একজন বিশেষ পরিচিত জন অসুস্থ—একা ফ্ল্যাটে থাকে সে—দেখা-শোনা করবার মত আপন জন কেউ নেই, তার কাছেই যাই—

তুমিই বুঝি তার একমাত্র আপন জন—

বলতে পার তাই।

তা সে ছেলে না মেয়ে?

এত খবর যখন তুমি জান মাসী—এ খবরটুকু কি আর জান না যে সে ছেলে না মেয়ে? তবে মিথ্যে কেন জিজ্ঞেস করছো আবার। না আমার মুখ থেকেই স্বীকৃতিটা বের করে নিতে চাও—

কথাটা বলে আর দাঁড়ায় নি মীনাক্ষী। অফিসের বেলা

হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি না খেয়েই জামা-কাপড় পরে অফিসে চলে যায়।

কিন্তু মুখে না বললেও বুঝতে পারছিল মীনাক্ষী—মাসীর বাড়িতে অতঃপর আর থাকা চলবে না। অন্য একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে—

শহরে মেয়েদের হোস্টেল ও বোর্ডিং দু-একটা আছে—খোঁজ করতে লাগল মীনাক্ষী এবং গড়িয়াহাটার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে জায়গা পেয়ে গেল।

মাসীকে কেমন করে কথাটা বলবে ভাবছে এমন সময় সুযোগ আপনা হতেই এসে গেল।

মাসী নয়—মেসো অবনীমোহনই একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন, চাকরি তোমাকে ছাড়তে হবে মীনা আর—

আর—

বিয়েও করতে হবে।

কিন্তু আমার অসুবিধা আছে দুটো ব্যাপারেই—

বড় হয়েছো, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছো—তাহলে, আর এখানেই বা কেন? হঠাৎ বলে বসেন অবনীমোহন।

আমি কালই চলে যাবো মেসোমশাই—

হ্যাঁ তাই যেও—

মাসী কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ায়, এসব কি হচ্ছে শুনি?

একটা ভাল লেডিজ হোস্টেলে জায়গা পেয়েছি মাসী সেখানেই যাচ্ছি।

মাসী বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি আর বলবে সে।

আর মীনাক্ষী চলে এসে হোস্টেলে ওঠে।

সেই দিন রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছে, মীনা যাচ্ছে না—পার্থ শুধায়, রাত হলো বাড়ি যাবে না মীনু—

ন'টায় যাবো—

কিন্তু অত রাত্রে বাড়ি গেলে তোমার মাসী—

আমিত কাল হোস্টেলে চলে এসেছি, মীনাক্ষী বলে।

সে কি!

হ্যাঁ—

মীনাক্ষী শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলে আর পার্থ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মীনু—

কি?

আমাকে সব খুলে বল।

কি বলব?

কেন তুমি হোস্টেলে উঠে এলে?

সত্যি কথা বলতে কি পার্থ, হোস্টেলে নয়, উঠে আসবার ইচ্ছে আমার এখানেই ছিল—আমাদের এই ঘরে কিন্তু জানিত তুমি কিছুতেই তা হতে দেবে না। চেঁচামেচি শুরু করবে, তাই অগত্যা হোস্টেলেই—

মাসী ও মেসোর সঙ্গে নিশ্চয়ই তুমি ঝগড়া করেছো!

করিনি তবে এর পরও থাকলে ঝগড়া হতো।

মীনু—

বল।

এ তুমি কি করলে—আমার জন্য—

তুমি চুপ কর, উত্তেজিত হয়ো না।

না, না—এ অন্যায়—এ—

চুপ কর। আজ রেডিওতে এখুনি তোমার গানের রেকর্ড বাজাবে। নিরিবিলিতে এখানে তোমার পাশে বসে তোমার গান শুনবো বলে এখনো হোস্টেলে যাই নি—বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে রেডিওটা অন্ করে দিল মীনাক্ষী।

আকাশবাণী কলকাতা। এবারে পার্থপ্রতীম চৌধুরীর কয়েকখানি গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনান হচ্ছে:

প্রথমটি রবীন্দ্র সংগীত—

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
বলেছে গান গাহিবারে ॥

ফুলে ফুলে তারায় তারায় বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবসরাতির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোয় অন্ধকারে ॥

মাস আষ্টেক বাদে X-ray করে আবার ডাঃ সর্বাধিকারী মীনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, He has improved wonderfully কিন্তু—

কি ডক্টর সর্বাধিকারী ?

এবারে ওর একটা অপারেশনের দরকার—তাহলেই ও বাকী জীবনটা সুস্থ হয়ে কাটাতে পারবে—

অপারেশন !

হ্যাঁ—

আপনি করবেন ?

না—ওকে তুমি ভেলোরে পাঠিয়ে দাও—আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো—

তাতে ত টাকা লাগবে !

তা লাগবে বৈকি !

কত ?

তা হাজার তিনেক ত লাগবেই—

মাথাটা যেন কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে ওঠে মীনার। তিন হাজার ! এই আট মাসে যা তার জমান ছিল সব গিয়েছে।

এখন একমাত্র সম্বল ওর প্রতি মাসের মাহিনাটা।

তাও কত আর, মাত্র একশ পঁচাত্তর টাকা।

হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে মীনাক্ষী।

সত্যিই ত—তীরে এসে প্রায় তরী ডুবেব। এতখানি করে এসে সে শেষটুকু করতে পারবে না।

কিন্তু টাকা।

অতগুলো টাকাই বা সে কোথায় পাবে।

অবশ্য এক সঙ্গে নয় মাসে মাসে টাকাটার দরকার হবে।

পার্থ বলে, কি হয়েছে তোমার বলত মীনু!

কেন—

নিশ্চয়ই তোমার কিছু হয়েছে। বল!

কি আবার হবে। কিছু না।

হয়েছে—গোপন করছো তুমি আমার কাছে।

গোপন করব কেন?

সত্যি বলছো।

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

॥ ৭ ॥

এমন সময় একদিন অফিসে। কিন্তু তার আগে—

এক্সপোর্ট ইম্‌পোর্টের অফিস। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অফিসের কারবার। বিরাট অফিস।

কয়দিন থেকেই মীনাক্ষী ভাবছিল চীফ্ বস মিঃ কুলকারনীকে বলবে, তার আরো কিছু টাকার প্রয়োজন—তাকে উনি আরো কিছু কাজ দিতে পারেন কিনা। অফিস আওয়ারের পরেও সে over time খাটতে রাজী আছে।

এবং চোখ-কান বুজে মিঃ কুলকারনীকে কথাটা একদিন বলেও ফেলে।

মিঃ কুলকারনী বলেন, ভেবে দেখবো—তুমি বরং একটা এ্যাপ্লিকেশন করে আমার কাছে দিও, যদি তেমন কোন সুযোগ দেখি ত—

মিঃ কুলকারনীর কথা ও আশ্বাস মত মীনাক্ষী একটা এ্যাপ্-লিকেশন করে তাঁর হাতে দেয়।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মিঃ কুলকারনীরই একটা অফিসের কাজে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে ঢুকে দেখে মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে বসে তিনি কি সব কথাবার্তা বলছেন।

মিঃ ফার্গুসনকে এর আগেও মধ্যে মধ্যে এই অফিসে ও দেখেছে।

অফিসে মিঃ কুলকারনীর কাছে কি কারণে কেন আসে মিঃ ফার্গুসন, কিছুই জানে না মীনাক্ষী। জানবার চেষ্টাও সে করেনি কোন দিন।

কাণাঘুষায় কেবল সে সামান্য শুনেছিল মিঃ ফার্গুসন সম্পর্কে —কোন একটা বিদেশী বড় কম্পানীর ডাইরেকটার নাকি লোকটা।

লম্বা-চওড়া—সুশ্রী লোকটা।

দামী ঝক্-ঝকে বেশভূষা—চোখে সর্বদা কালো কাচের চশমা পরা থাকে।

বিরাট একটা শাদা রঙের লাকসারী এ্যামেরিকান কারে করে অফিসে আসতেও একদিন দেখেছিল মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনকে।

ও ঘরে ঢুকতেই মিঃ ফার্গুসন ওর দিকে একবার তাকায়।

হাতে একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট।

মীনাক্ষী কুলকারনীর সঙ্গে কথা বলে কিন্তু ও বুঝতে পারে মিঃ ফার্গুসন কালো কাচের চশমার ওধার থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

এর আগেও দু' একবার লক্ষ্য করেছে মিঃ ফার্গুসনকে ওর দিকে অমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে কালো চশমার ভিতর থেকে।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে মীনাক্ষী।

কথা শেষ করে চলে যাবার আগে মীনাক্ষী কুলকারনীকে বলে, আমি যে এ্যপ্লিকেশন করেছিলাম তার কি হলো স্যার—

I could not find any suitable job for you yet Miss Roy—তবে I am on look out. পেলেই তোমাকে জানাব।

আমার একজন আত্মীয় বিশেষ পীড়িত—তার চিকিৎসার জন্যই—আজ কথাটা বলেই ফেলে মীনাক্ষী সহসা।

বললাম ত তোমাকে মনে আছে আমার—and I would be rather glad if I could help you.

মীনাক্ষী অতঃপর বের হয়ে আসে মিঃ কুলকারনীর অফিস চেম্বার থেকে।

টাকা।

তার টাকার প্রয়োজন।

পার্থকে যেমন করে হোক ভেলোরে পাঠাতেই হবে।

অপারেশন করিয়ে তারপর যা করা প্রয়োজন সব করিয়ে পার্থকে সুস্থ করে তুলতেই হবে।

কিন্তু কিছুতেই ভেবে পায় না মীনাক্ষী কোথা থেকে টাকা আসবে।

কেমন করে কোথা থেকে টাকা সে পাবে।

অফিস থেকে বেরুতে সেদিন একটু দেরিই হয়ে যায়। অনেক-গুলো ফাইল জমেছিল—তার চিঠিপত্র প্রস্তুত করে বেরুতে বেরুতে সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা হয়ে গিয়েছিল!

অফিস পাড়াটা তখন অনেকটা পাতলা হয়ে গিয়েছে।

মানুষের ভিড় কমতে শুরু করেছে।

লিফট্ দিয়ে নীচে নেমে ফুটপাতে পড়ে হাঁটতে শুরু করে মীনাক্ষী।

অফিস থেকে সাধারণত সে হেঁটেই পার্থর ফ্ল্যাটে যায় তারপর রাত্রে সেখান থেকে শেষ ট্রামে সেকেণ্ড ক্লাশে হোস্টেলে ফেরে।

আজ দেরি হয়ে গেল—পার্থ হয়ত চিন্তা করছে—বাসে যেতে পারলেই ভাল হতো কিন্তু মাসের শেষ—হাত প্রায় খালি।

তা ছাড়া কাল আবার পার্থর কয়েকটা ঔষধ কেনা দরকার—ফুরিয়ে গিয়েছে।

অতএব হেঁটেই চলে ফুটপাত ধরে।

বিকেল থেকে মাথাটাও ধরে আছে। কপালের দু'পাশে রগ দুটো ব্যথায় টিপ্ টিপ্ করছে।

কুলকারনী—অর্থাৎ বস্ লোকটা ভাল।

বেশী বিরক্ত করতে সাহস হয় না। কিন্তু না বিরক্ত করেই বা তার উপায় কি। টাকার প্রয়োজন যে তার।

টাকা তার না হলে পার্থকে সে সুস্থ করে তুলতে পারবে না।

এ যে তার নিজের মনের কাছে চ্যালেঞ্জ। ভালবাসার চরম পরীক্ষা।

ক্যাচ্ করে একটা মৃদু শব্দ একেবারে পাশেই। সঙ্গে সঙ্গে

চমকে ফিরে তাকায় পাশে মীনাক্ষী। বিরাট শাদা রঙের এ্যামে-রিকান লাকসারী কার একটা।

আরে—কি আশ্চর্য। মিঃ ফার্গুসনের সেই সাদা গাড়িটা না। হ্যাঁ মিঃ ফার্গুসনই। গাড়ির জানালা পথে মুখখানা বের হয়ে এল মিঃ ফার্গুসনের।

সেই কালো কাচের চশমা চোখে।

মিস রয়—

একটা অপরিচিত মৃদু কণ্ঠস্বর।

কে?

গাড়িটা একেবারে যেন মীনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

মিস্ রয়, নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পারছেন—আমি ফার্গুসন—বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন গাড়ি থেকে বের হয়ে মীনাক্ষীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ ফার্গুসনই আবার বলে, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল—

আমার সঙ্গে?

কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয় কথাটা মীনার কণ্ঠ হতে।

হ্যাঁ—

কিন্তু—

আসুন আমার গাড়িতে—যেখানে আপনি নামতে চান I will drop you—

না, না—আমার—

It won't take more than five minutes—আসুন না—আপনি তখন মিঃ কুলকারনীকে চাকরির কথা বলছিলেন না—তিনি নিজেও আমাকে আজ request করলেন আপনার জন্য—সেই চাকরির ব্যাপারেই কথাটা—

চাকরি!

হ্যাঁ—আসুন—

তবু মীনাক্ষী যেন ইতস্ততঃ করে।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, মনে হচ্ছে আমার কথায় আপনি যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না—ভয় নেই আসুন—

বাপের বয়েসী একটা লোক বার বার করে বলছে আর তার উপকার করতেই চাইছে—শেষ পর্যন্ত যেন এড়াতে পারে না মীনাক্ষী তাকে।

আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

ফার্গুসন বলে, মনসুর চল—

মুসলমান ড্রাইভার মনসুর আলি গাড়ি ছেড়ে দেয়।

গাড়ি সন্ধ্যার জনবহুল আলোকিত পথ ধরে চলেছে।

বিরাট লাকসারী কারের আরামপ্রদ নরম ভেলভেটে মোড়া গদী।

গাড়ি চলেছে—মনে হয় যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছে।

এক সময় আবার ফার্গুসনই কথা বলে :

শুনুন একটা ভাল চাকরি আমার হাতে আছে—

চাকরি আপনার হাতে।

ফিরে তাকায় মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—মাইনে আপাততঃ চার শ টাকা—

কি—কি বললেন—

কথাটার আবার পুনরাবৃত্তি করে ফার্গুসন—হ্যাঁ চারশ টাকা—of course if you can prove your efficiency—আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যা অবশ্যই আপনার মত একজন মেয়ে প্রুফ করতে পারবেন—they will pay you more.

চারশ টাকা মাইনের চাকরি—

কানের মধ্যে তখনো যেন টাকার অঙ্কটা গুঞ্জন করে ফিরছে। একটা মধু গুঞ্জনের মত যেন গুনগুন করে চলেছে : চারশ টাকা। চারশ টাকা মাইনের চাকরি।

আড় চোখে ফার্গুসন একবার মীনাক্ষীর মুখের দিকে চেয়ে নিল তারপর পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট তা থেকে নিয়ে ধরাতে ধরাতে মৃদু কণ্ঠে বলে, কথাটা আমি বস্ কুলকারনীকে বলবো আজই ভেবেছিলাম কিন্তু পরে ভাবলাম তোমার ঐ চাকরিটা নিতে আপত্তি আছে কিনা আগে জানা দরকার। একটা কথা—এ চাকরির সঙ্গে কিন্তু এখন যে চাকরি বর্তমানে তুমি করছো তার কোন সম্পর্ক নেই—এটা সম্পূর্ণ একটা Part time চাকরি—

এতক্ষণে মীনাক্ষী কথা বলে। বলে, পার্টটাইম চাকরি!

হ্যাঁ—যে চাকরি তুমি বর্তমানে করচো তার সঙ্গে সঙ্গেই এ চাকরি অনায়াসেই করতে পারবে। তোমার বস্‌ও বলছিল you are in need of money—টাকার নাকি তোমার দরকার—

টাকার দরকার।

হ্যাঁ—তার টাকার দরকার বৈকি। আজ তার মত টাকার দরকার আর কার।

পার্থ—পার্থকে ভেলোরে পাঠাতে হবে।

ডাঃ বলেছেন ভেলোর থেকে অপারেশন করে কিছু দিন কোন হিল স্টেশনে কাটিয়ে আসতে পারলেই পার্থর আর কোন ভয়ই থাকবে না।

ব্যবস্থা তাকে একটা যেমন করে হোক করতে হবেই।

আজ তার সমস্ত জীবন একদিকে—পার্থ একদিকে।

হঠাৎ আবার ফার্গুসনের প্রশ্নে চম্‌কে ওঠে মীনাক্ষী, কি ভাবছো মিস রয়?—

য়্যাঁ—না—কিছু না—

তোমার টাকার দরকার যখন—এ চাকরিটা

চাকরি—

হ্যাঁ—আমি বলছিলাম রাজী হয়ে যাও।

আমি—

দেখো মিস রয়—সুযোগ কারো জীবনে হামেশাই আসে না—যখন আসে তখন তাকে কি উচিত নয় সাদরে গ্রহণ করা—

কিন্তু মিঃ ফার্গুসন—

সহসা ফার্গুসন প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়, মীনাক্ষীকে বাধা দিচ্ছে যেন—

বলে, বলছিলাম কি তোমার যদি খুব তাড়াতাড়ি না থাকে—We can go somewhere &. have some time—তুমি নিশ্চয়ই পিপাসার্ত—

না, না—সে আমি বাড়ি গিয়েই—

বিলক্ষণ। সে ত খাবেই এবং প্রত্যহই খাও। আজ না হয় আমার সঙ্গে—this old man-এর সঙ্গে বসে এক কাপ চা পান করলেই—

কিন্তু—

মনসুর—গ্রেট্: ইস্টার্ণ চল—আদেশ দিল মিঃ ফার্গুসন তার ড্রাইভারকে।

মনসুর গ্রেট্ ইষ্টার্ন হোটেলের দিকে গাড়ি চালায়।

এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই হোটেলের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়।

আলোয় আলোয় ঝক্‌ঝক্ করছে একেবারে হোটেলের সামনেটা। বহু সুবেশা নরনারীর আনাগোনা।

উর্দি পরিহিত দরোয়ান সেলাম দেয় ওদের।

কাউণ্টার রিসেপসনিষ্টরা কর্মব্যস্ত।

দূর থেকেই বরাবর মীনাক্ষী দেখেছে এ সব বিলাসের জায়গা—এই সব বিলাস-বহুল ভোজনাগার ও বাসস্থানগুলো ইতিপূর্বে।

কখনো এর ভিতরে ইতিপূর্বে পা দেয় নি।

একটা স্বপ্নের মত দূর থেকে মনে হয়েছে।

কি একটা বিচিত্র নেশায় যেন সবটা আচ্ছন্ন করে ফেলে।

লিফটে করে উঠে দু'জনে চাইনীজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রবেশ করে।

চারিদিকে ঝক্‌ঝকে টেবিল চেয়ার সাজান। আলোয় আলোয় চারিদিক ঝলমল করছে।

উর্দি পরিহিত সব ওয়েটার। অনেকেই বসে চা পান করছিল। অনেকের চাপা কণ্ঠস্বরের আলাপ একটা বিচিত্র গুঞ্জন তুলেছে।

একটা নির্জন কোণে একটা টেবিলে গিয়ে ওরা বসল।

মিঃ ফার্গুসন চায়ের অর্ডার দিলেন।

কি খাবে আর বল?

না, না—কিছু না শুধু চা—

কিছু অন্তত খাও—চিকেন। স্যাণ্ডউইচ—

না—

পেষ্ট্রি—

না—

চা পান করতে করতেই আবার পূর্ব আলাপে ফিরে আসে মিঃ ফার্গুসন।

আগেই তোমাকে বলেছি—part time job—খুব পরিশ্রমের ব্যাপার কিছু নয়—আর টাইম বেঁধে অনেকক্ষণ ধরে করবার মতও কিছু কাজ নয় আপাততঃ; কারণ যে অফিসের কথাটা তোমাকে বলেছি- সেটা মাত্র কয়েক মাস হলো ষ্টার্ট করেছি—মানে নতুন ব্রাঞ্চটা সবে ষ্টার্ট করা হয়েছে—তারপর একটু বস বলি, তাহলেও অবিশ্যি—কাজটা গুরুত্বপূর্ণ আর তাই এমন একজনের সন্ধান আমরা করছিলাম—যাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে এবং যার পরে কাজটা দিয়ে নির্ভর করা যেতে পারে—

শুনেই যায় মীনাক্ষী—কোন জবাব দেয় না। চায়ের কাপটা সামনে—ধোঁয়া উঠছে।

মীনাক্ষী ভাবছিল: চারশ টাকা মাইনার part time job—

কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে সে চেয়ে থাকে মিঃ ফার্গুসনের মুখের দিকে।

কিন্তু কাজটা কি নিশ্চয়ই তুমি ভাবছো তাই না মিস রয়—কাজটা হচ্ছে একজন করেসপনডেন্স ও ডেসপ্যাচ্ ক্লার্কের কাজ।

করেসপনডেন্স ও ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক ?

হ্যাঁ, কাজটা যদিও বাইরে থেকে তেমন কিছু একটা মনে হয় না তাহলেও গুরুত্বপূর্ণ কারণ কেবল করেসপনডেন্স্ ও ডেসপ্যাচে্র কাজই নয়—ডেসপ্যাচ্ ও করেসপনডেন্স্ সব তোমাকেই তোমার বিচার বিবেচনা মত করতে হবে—চিঠিগুলো পড়ে নিজের বুদ্ধিমত কতকটা—মানে—

মীনাক্ষী কেমন যেন বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

হ্যাঁ—মানে খুলেই তোমাকে তাহলে কথাটা বলি—একজন অফিসিয়াটিং ম্যানেজার যদিও আছে—চিঠি পত্রগুলো—অর্থাৎ করেসপনডেন্স্ তোমাকেই প্রয়োজন মত করতে হবে—

কিন্তু আমি—

ভাবচো পারবে না! খুব পারবে। তাছাড়া তোমার বস্ মিঃ কুলকারনী তোমার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ ত করেনই—আমিও কিছুদিন ধরে তোমার কাজকর্ম দেখে তবে তোমার কথা ভেবেছি মিস্ রয়—কারণ আমিও তাই ভাবি তোমার সম্পর্কে।

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

সব সময়ত ঠিক মানুষটি পাওয়া যায় না। তাই অসুবিধাও হচ্ছিল—শোন তোমাকে সব কথাই খুলে বলা দরকার—আমাদের কম্পানী মানে রাদারফোর্ড মরিসন কম্পানীর কোন অফিস কলকাতাতে নেই; মিঃ ফার্গুসন বলে, ইণ্ডিয়াতে দিল্লী আর বম্বেতে অফিস আছে অথচ কলকাতা শহরেও কম্পানীর অনেক কাজ—তাই এখানে মরিসন কম্পানী আপাততঃ একজন ডেঃ ম্যানেজার ও একজন করেসপনডেন্স্ ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক নিযুক্ত করতে মনস্থ করেছে। ডেঃ ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে গিয়েছে—দিন কয়েক হলো—and he is one of the relatives of Mr. Kulkarni—

Mr. Chandramadhav—চন্দ্রমাধব দোশানী—। আমরা একজন ডেসপ্যাচ্ ক্লার্ক খুঁজছিলাম—dutiful, faithful এবং পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান হবে। মিঃ কুলকারনীর কাছে তোমার কথা শুনে তোমার পরিচয় পেয়ে ও তোমায় দেখে মনে হলো—if you accept this job—তাহলে বোধহয় আমরা যেমনটি খুঁজছি তেমনটি হয়।

তোমাদের অফিস কোথায়? এতক্ষণে কথা বলে মীনাক্ষী।

দূরে নয় অফিসটা তোমাদেরই অফিসের পিছনে তিনতলার একটা ছোট ফ্ল্যাটে—তোমার অফিস আওয়ার্সের পরে—সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছয়টা দু'ঘণ্টা ডিউটি—মাইনে প্রথমতই বলছি আপাততঃ চারশ টাকা—

আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও মিঃ ফার্গুসন—

Sure—ভাবতে চাও নিশ্চয়ই ভাবতে পার, তবে বেশী টাইম নিও না—কারণ আরো একজনকে আমরা দেখেছি—তুমি যদি না রাজী থাক ত তাকেই appointment দেবো আমরা—

বেশ—

এই ফোন নম্বরটা রাখ—আমার সঙ্গে হয়ত দেখা হবে না তোমার, কারণ কালই আমি বম্বে চলে যাচ্ছি কয়েকদিনের জন্য—তুমি যদি রাজী থাকত ঐ ফোন নাম্বারে চন্দ্রমাধবকে ফোন করে দিলেই তোমার appointment হয়ে যাবে—

॥ ৬ ॥

তারপর—আমি জিজ্ঞাসা করি, মেয়েটি কি করল? চাকরি নিশ্চয় নিল।

ডাঃ মৃদু হেসে বলে, তোমার কি মনে হয় কবি?

বলি, নেওয়াইত উচিৎ—

কেন!

সেটাই স্বাভাবিক বলে।

ডাঃ হাসে।

বিরাট শাদা গাড়িটা সরু রাস্তায় ত ঢুকবে না তাই বড় রাস্তার মোড়ে মীনাক্ষীকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সে রাত্রে ফার্গুসন।

চারশ টাকা মাইনার চাকরি—মাত্র দু'ঘণ্টার কাজ।

এবং আগাগোড়া আজ সন্ধ্যার সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে এতবড় একটা সুবর্ণ সুযোগ তবু কেন জানি মনের মধ্যে কোন সাড়া পায় না মীনাক্ষী।

কোথায় যেন একটা সন্দেহ—কোথায় যেন একটা সংশয় ওর মনকে পীড়িত করতে থাকে কেবলই।

প্রথমতঃ নতুন এক কোম্পানী—

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ করেসপনডেন্স্ ডেসপ্যাচ্ ক্লার্কের চাকরি—

তৃতীয়তঃ চারশ টাকা মাইনা।

লোকের—অর্থাৎ প্রার্থীর অভার হওয়া উচিত নয়—কেবল একটা বিজ্ঞাপন কাগজে। হাজার হাজার এ্যাপলিকেশন পড়বে সঙ্গে সঙ্গে। এডর্ভাটাইজমেণ্টও দেয়নি—সোজা রিক্রুটমেণ্ট। কিন্তু কেন?

মনটার মধ্যে নানা সন্দেহ ও সংশয় উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়—তার টাকার দরকার। পার্থর জন্য তার টাকার দরকার।

এত কথা তার ভাববারই বা প্রয়োজনটা কি!

চাকরী ত সে চাইছিলই—পেয়েছে—সে নেবে।

অবিশ্যি এটা ঠিকই—হাজারটা এ্যপ্লিকেশন পড়তো হয়ত কিন্তু ওদের প্রয়োজন হয়ত কাউকে বিশ্বাসী ও জানাশোনা—যা হয়ত ওরা পেত না।

কিম্বা হয়ত মিঃ কুলকারনীই তার সম্পর্কে রেকমেণ্ড করেছেন।

একবার মনে হয় মীনাক্ষীর পার্থকে সব খুলে বলে—কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় কি প্রয়োজন পার্থকে জানাবার কথাটা।

সারাটা দিন অফিসের কাজ করার পর আবার কাজ করতে কিছুতেই তাকে সে মত দেবে না তা সে ভাল করেই জানে।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে পার্থর ঘরে এসে পা দেয় মীনাক্ষী।

অন্যান্য দিন ঐ সময়টা পার্থ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়ায় বা জানালার কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে থাকে।

আজ দেখল বিছানায় শুয়ে পার্থ।

কি ব্যাপার—শুয়ে যে! মীনাক্ষী শুধায়।

মৃদু হেসে পার্থ বলে, এমনি—তোমার আজ দেরি হলো যে?

একটু কাজ ছিল—বলতে বলতে এগিয়ে এসে পার্থর কপাল স্পর্শ করতেই চম্‌কে ওঠে মীনাক্ষী।

বেশ জ্বর!

এ কি—জ্বর হলো আবার কখন?

দুপুর থেকে—

আবার জ্বরটা এলো কেন?

শুধু জ্বর নয় দেখা গেল সঙ্গে একটু কাসিও দুপুর থেকে দেখা দিয়েছে।

পরের দিন সকালেই ডাঃ সর্বাধিকারীকে ফোন করল মীনাক্ষী।

ডাঃ সর্বাধিকারী এলেন—এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন।

বললেন, বিশেষ কিছু নয়— ঔষধটা পাল্টে দিচ্ছি—

নীচে ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে সঙ্গে নেমে যায় মীনাক্ষী।

ডাক্তার মুখে যাই বলুন মীনাক্ষীর মনের সংশয় যায় নি।

জিজ্ঞাসা করে, আবার জ্বরটা এলো কেন ডাঃ সর্বাধিকারী?

অপারেশনটা করা দরকার—তারপর কিছুদিন কোন পাহাড়ে থাকতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে ত আমি বলেছি মিস্ রায়, সেই ব্যবস্থাই করুন যত শীঘ্র পারেন। তাছাড়া এখানে রেষ্ট্ হলেও পরিবেশটা ঠিক ওর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়—

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে এল মীনাক্ষী উপরে।

কি বললে তোমায় ডাক্তার? ক্যামেলিয়া—।

বললেন যা শুনলে ত ও কিছু নয়—

করুণ হেসে বলে পার্থ, মিথ্যেই তুমি চেষ্টা করছো গো—

পার্থ—

হ্যাঁ—আমাদের সাধ্য কি যে আমরা এই ব্যাধির সঙ্গে যুদ্ধ করি—সামান্য আমাদের পুঁজি—সামান্য আমাদেব ক্ষমতা—কথায় বলে রাজব্যাধি—

পার্থ—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে ওঠে মীনাক্ষী।

শোন—কাছে এসে বোস—দেখ, সময় চলে যাচ্ছে—আর নিজেকে এমনি করে সর্বস্বান্ত করো না। কেন আমার জন্য মিথ্যা আর এমনি করে নিজেকে নিঃস্ব করছো! দেখছো না প্রতি মুহূর্তে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি—হেরে যাচ্ছি—

সহসা মীনাক্ষী পার্থকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে. না, না—গো না ও কথা বলো না। আমরা ব্যর্থ হইনি—আমরা হারবো না—কিছুতেই আমরা হারবো না। ঘর বাঁধবো—নিশ্চয়ই আমরা ঘর বাঁধবো—

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে পার্থ মীনাক্ষীর কথায়। শিউরে ওঠে যেন।

কামনার এমন উগ্র ছবি কখনো তার চোখে পড়েনি ইতিপূর্বে।

কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কোন শব্দ বের হয় না। বোবা হয়ে থাকে। পাথর হয়ে থাকে।

তারপর এক সময় রোগক্লিষ্ট শীর্ণ হাত দুটো দিয়ে মীনাক্ষীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি সামনে তুলে ধরে মৃদু গাঢ় কণ্ঠে ডাকে, ক্যামেলিয়া!—

বল।

না—থাক—আর আমি কোন দিন কিছু বলবো না।

পার্থর সমস্ত শরীরটা তখন কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি পার্থকে ধরে শুইয়ে দেয় মীনাক্ষী, তুমি কাঁপছো শুয়ে পড়।

সে রাত্রে আবার অনেক দিন পরে শীত শীত করে ধুম জ্বর আসে পার্থর।

আর কোন সংশয় নেই মীনাক্ষীর।

আর কোন দ্বিধা নেই।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে পার্থর ওখানে এসে পার্থর জ্বর দেখে সে সংকল্প স্থির করে নেয়।

এবং পরের দিনই অফিসে গিয়ে যে ফোন নম্বরটা দিয়েছিল ফার্গুসন সেই ফোন নাম্বার ডায়াল করে ফোন করে।

কাকে চাই? প্রশ্ন ভেসে আসে ভারী পুরুষের গলায়।

মিঃ চন্দ্রমাধব দোশানী আছেন?

কথা বলছি—

আমি মীনাক্ষী রায়—

গুড্ আফটারনুন—কি খবর বলুন?

মিঃ ফার্গুসনকে বলবেন আমি চাকরি নেব।

খুব ভাল কথা। কবে থেকে জয়েন করবেন বলুন?

মিঃ ফার্গুসন কি আছেন?

না—নেই তবে আমাকে instruction দিয়ে গিয়েছেন আপনার সম্পর্কে। কবে চাকরিতে জয়েন করতে চান আপনি বলুন।

আপনি যে দিন বলবেন।

ধরুণ আজই যদি বলি আপত্তি আছে ?

আজই !

হ্যাঁ—শুভ কাজে বিলম্বের প্রয়োজন কি ? ও যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল নয় কি ?

বেশ—

তাহলে আজ আসছেন অফিসের পরে ?

আসবো।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গিয়ে নতুন অফিসে ঢুকল মীনাক্ষী।

নামেই অফিস।

আসলে অফিস তাকে বলা যায় কি না সন্দেহ। অন্তুতঃ মনে হয় না সেটা মীনাক্ষীর।

দোতলায় ছোট একখানি ঘর।

ঘরের মধ্যে কাঠের পার্টিশন।

পার্টিশনের এদিকে ম্যানেজার চন্দ্রমাধব বসে অন্য দিকে তুটি টেবিল ও তুটি চেয়ার। দেওয়ালে একটা চিনের ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার।

একটি স্টীলের আলমারী ও একটা টাইপ রাইটিং মেসিন। খান তুই চেয়ার স্টীলের।

বেঁটে রোগা মত একটি লোক একটি টেবিল অধিকার করে একমনে মাথা নীচু করে কাগজের 'পরে কলম দিয়ে কি যেন লিখছে। লোকটার বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে বলেই মনে হয়।

মাথার সামনের দিকটায় চক্‌চকে একটি টাক।

গোলাল মুখ—ঠোঁটের উপরে ছোট্ট একটি বাটারফ্ল্যাই গোঁফ।

চোখে চশমা—চশমার ব্রিজটা নাকের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। পরনে স্যুট।

বাইরে একটা টুলের উপর দরোয়ান বসেছিল। সেই নাম বলতে মীনাক্ষীকে ভিতরে প্রবেশ করতে বলেছিল।

বলেছিল, অন্দর যাইয়ে—।

মীনাক্ষী ভিতরে পা দেয় তারপর।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কর্মরত ঠোঁট বোগা লোকটি চোখ তুলে তাকায়।

লোকটা তোতলা কথা বলতেই বুঝতে পারে ও এবং শুধু তোতলাই নয় কানেও একটু খাটো। কম শোনে।

আপনি—মা-মী-মী—

মীনাক্ষী রায়—লোকটা তোতলা বুঝতে পেরে নিজেই বলে মীনাক্ষী নামটা।

মিঃ দোশানী আছেন?

কি ব-বললেন রা-রাজেন—রাজেন ত এখানে—কে-কেউ নে-ই।

বুঝল মীনাক্ষী লোকটা শুধু তোতলাই নয় কানেও খাটো।

একটু উঁচু গলাতেই এবার বলে মীনাক্ষী, রাজেন নয়—মিঃ দোশানী কি আছেন?—

আ—আছেন—ঐ-যে ভিতরে যান।

ঘরের মধ্যে পার্টিশনের সুইংডোরটা দেখিয়ে দিল লোকটা মীনাক্ষীকে। সে গিয়ে দরজায় নক্ করে।

সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান আসে, কাম—ইন—

মীনাক্ষী সুইংডোর ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করে।

এ ঘরটার মধ্যে বা ঐ অংশটার মধ্যেও আসবাবপত্রের কোন বাহুল্য নেই।

একটি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল—একটা ফোন—কিছু ফাইলপত্র টেবিলের 'পরে।

পিছন দিকে একটা ছোট সাইজের স্টীলের আলমারী।

মোটা মত একটি লোক রিভলভিং চেয়ারটার উপর বসে ফোনে ইংরেজীতে যেন কার সঙ্গে কথা বলছিল।

ইংরেজী উচ্চারণটা যেন কেমন একটু ভাঙ্গা ভাঙ্গা—একটা বিদেশী টান যেন রয়েছে।

বয়স লোকটার পঞ্চাশের উপরেই হবে বলে মনে হয়।

মাথার মাঝখানে টাক—দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে। চোখমুখ অনেকটা যেন মংগোলিয়ান টাইপের।

ছোট ছোট গোল গোল চোখ -ভোঁতা নাক।

দাড়ি গোঁফ নিখুঁত ভাবে কামান।

গাত্রবর্ণ কেমন যেন একটু হরিদ্রাভ।

পরনে দামী স্যুট।

ও ঘরে প্রবেশ করতেই চোখের ইংগিতে বসতে বললে ওকে ভদ্রলোক ফোনে কথা বলতে বলতেই।

মিনিট দুই পরে ফোন শেষ করে লোকটা ওর মুখের দিকে তাকাল, we are glad যে আপনি চাকরিতে জয়েন করলেন, here is your appointment letter—

একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিল দোশানী।

ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলে।

মীনাক্ষী হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল।

কাজ অবিশ্যি আপাততঃ খুব একটা বেশী কিছু নেই—কারণ we have just started our office in Calcutta. ভাল কথা —you know type writing মিস্ রয়?

জানি—

আজকের থেকেই কাজ করবে কি?

করতে পারি।

কোন অসুবিধে হবে না?

না—

একটা ফাইল টেনে ওর সামনে ঠেলে দিল দোশানী, এই ফাইলের চিঠিগুলোর জবাব যাবে ১, ২, ৩, করে পাশে পাশে নোট করা আছে। গুছিয়ে চিঠিগুলো তৈরী করে টাইপ করে দাও-

ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী।

স্টেনো মীনাক্ষী রায়কে ঐ ধরনের চিঠি হামেশাই তৈরী করে টাইপ করতে হয়—খুব একটা শক্ত কাজ কিছু নয় মীনাক্ষীর পক্ষে কাজটা।

মীনাক্ষী পার্টিশনের এদিকে এসে আগের সেই বেঁটে লোকটিকে শুধাল, ঐ মেসিনটা কি আমি ব্যবহার করতে পারি?

লোকটি বলে—নি—নিশ্চয়—ও—ওখানেই ত আ—আপনি কাজ করবেন—ব—বসুন না—

মীনাক্ষী গিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসল টেবিলের সামনে। মেশিনের ঢাকনীটা তুলল—

খান তিনেক চিঠি ছিল ফাইলে।

প্রথমে মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলো আগাগোড়া বার দুই করে পড়ল মীনাক্ষী।

নানা ধরনের ব্যবসা মরিসন কম্পানীর।

চিঠিগুলো কম্পানীর এক্সপোর্ট সংক্রান্ত। আসামের কোন একটা চা বাগান থেকে চা বিদেশে চালান যাবে সেই সম্পর্কে চিঠি একটা—অন্য একটা চিঠি—আসামের তৈল শোধনাগারের কর্তৃপক্ষকে —আর একটা চিঠি একটা চায়না জাহাজ কম্পানীকে।

মনে মনে চিঠির জবাবগুলো মুসাবিদা করে টাইপ করতে শুরু করে মীনাক্ষী।

নোট অনুযায়ী চিঠিগুলো গুছিয়ে টাইপ করে তৈরী করতে ঘণ্টাখানেক লাগে মীনাক্ষীর।

টাইপ হয়ে গেলে গুছিয়ে নিয়ে চিঠিগুলো ফাইল সমেত উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী—প্রায় সাতটা সন্ধ্যা তখন হাত ঘড়িতে তার।

সুইংডোর ঠেলে দোশানীর ঘরে ঢুকে চিঠিগুলো সামনের টেবিলের 'পরে রাখল মীনাক্ষী।

কি একটা ফাইল দেখছিল দোশানী—মুখ তুলে তাকাল।

Finished? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায় দোশানী।

হ্যাঁ—

দেখি—

টাইপ করা চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দোশানীর—good—very good—o. k. আজকের মত ছুটি—you can go.

যাবো ?

Oh—yes—

কাল কখন আসতে হবে ?

যে সময় এসেচো আজ সেই সময় আসলেই হবে—আর শোন একটা কথা, আমি হয়ত অফিসে সব সময় নাও থাকতে পারি—ঘনশ্যাম থাকবে—ওর কাছেই File রেখে যাবো—ভিতরে instruction থাকবে—বাইরে যে ক্লার্ক কাজ করছে ঐ ঘনশ্যাম বাগ—

মীনাক্ষী বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসছিল—দোশানী ডাকে আবার, এক সেকেণ্ড মিস রয়—

মীনাক্ষী ঘুরে দাঁড়াল।

মিঃ ফার্গুসন আমাকে instruction দিয়ে গিয়েছে—তোমাকে এক মাসের মাইনা advance দিতে—ইচ্ছা করলে তুমি আজ এখনই নিতে পার—

এক মাসের মাইনে—

হ্যাঁ তোমার নাকি টাকার দরকার—

So kind of Mr. Furguson—তাকে যে কি বলে আমি ধন্যবাদ জানাব—

না, না—এতে ধন্যবাদের কি আছে। তুমি আমাদের employee. তোমার সুখ-সুবিধা আমাদের দেখতে হবে বৈকি—here is your money—টাকা ও একটা পে ভাউচার এগিয়ে দেয় মিঃ দোশানী ওর দিকে।

মীনাক্ষীর হু' চোখে জল ভরে আসে।

ভাউচার সই করে টাকা নিয়ে মীনাক্ষী বের হয়ে আসে ঘর থেকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে।

পাশের ঘরটা তখন খালি—কেউ নেই—কখন যেন ঘনশ্যাম চলে গিয়েছে।

দরজা ঠেলে অফিস থেকে মীনাক্ষী বের হয়ে এলো—দরোয়ানকেও দেখতে পেল না টুলটার উপরে উপবিষ্ট বাইরে। সেও চলে গিয়েছে তখন।

লম্বা একটা প্যাসেজ—টিম্ টিম্ করে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে—তাতে করে অন্ধকার ত দূর হয়ই নি—উপরন্তু একটা রহস্যময় আলো-আঁধারীর সৃষ্টি করেছে যেন।

একেবারে নির্জন খাঁ খাঁ করছে প্যাসেজটা যেন। কোন শব্দ নেই কোথাও।

প্যাসেজের গা দিয়ে যে সব ঘরের দরজা—সবই বন্ধ। এখানে কেউ থাকে বলেই মনে হয় না।

পায়ে পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় মীনাক্ষী।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে হঠাৎ কানে আসে একটা ভারী পদশব্দ। পদশব্দটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে।

কেউ আসছে সিঁড়ি দিয়ে উপরে।

দাঁড়ায় মীনাক্ষী।

এক পাশে সরে দাঁড়ায়। চোখে পড়ে লম্বা ঢ্যাঙ্গা মত একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। লোকটার পরিধানে দামী স্যুট।

লম্বা টাইপের মুখ—ওষ্ঠের উপর ভারী এক জোড়া গোঁফ। দাড়িও আছে—সুর দাড়ি।

লোকটা কিন্তু মীনাক্ষীর দিকে একবার তাকালও না।

জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ করতে করতে পাশ দিয়ে উঠে উপরে চলে গেল।

মীনাক্ষী আবার নামতে থাকে।

গাটার মধ্যে অকারণেই কেন যেন কেমন ছম্‌ছম্ করতে থাকে।

সিঁড়ির শেষে একটা অফিসের উঠোন—তারপর সরু একটা অন্ধকার গলিপথ।

গলিপথ পার হলে বড় রাস্তা। কিন্তু তখন ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চল অনেকটা নির্জন হয়ে এসেছে।

মানুষের ভিড় নেই, সমস্ত দিনের চঞ্চল কর্মব্যস্ততা, ও যেন আর নেই।

বিরাট বিরাট বাড়িগুলো যেন রাতের মত কর্মের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।

কেন যেন হাঁটতে ভাল লাগে না মীনাক্ষীর।

একটু এগুতেই একটা খালি ট্যাক্সী পেয়ে তাতে উঠে বসল মীনাক্ষী।

আজ ত টাকায় ব্যাগ ভর্তি। আজ একটা দিন টাকার জন্য কৃচ্ছ্র সাধন নাই বা করল সে।

তাছাড়া রাতও হয়ে গিয়েছে তখন।

এত রাত ফিরতে কখনোত হয় না।

চাকরি তাহলে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি নিল? শুধালাম আমি। ডাক্তার বন্ধু তার সিগ্রেটটা শেষ হওয়ায় নতুন একটা সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করছিল—জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়া নিভিয়ে এ্যাসট্রেটার মধ্যে ফেলতে ফেলতে বলে, হ্যাঁ—পার্থকে সত্যিই সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল মেয়েটা—এত কষ্ট করে ছেলেটিকে মৃত্যুর মুখ থেকে বলতে গেলে ফিরিয়ে এনে শেষের মুখে এসে সব নষ্ট হয়ে যাবে তাই বোধহয় আর কোন দিকেই সে তাকায় নি—নতুন চাকরির ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতেও চায় নি—যাক—শোন তারপর—

॥ ৭ ॥

পরের দিনই ডাঃ সর্বাধিকারীকে গিয়ে মীনাক্ষী বলে টাকার ব্যবস্থা সে যা হোক করে করবে, তিনি পার্থকে ভেলোরে পাঠাবার যেন ব্যবস্থা করেন।

ডাক্তার সর্বাধিকারী আশ্বাস দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ব্যবস্থা করবেন।

ডাঃ একটু থেমে আবার বলে—ঐ সময়কার ডাইরীর পাতায় মনের মধ্যে যে বেচারীর সর্বক্ষণ একটা সংশয়ের পীড়ন চলছিল সেটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় তার কিছু কিছু লেখা থেকে।

হ্যাঁ—মনের মধ্যে একটা সংশয় যেন সর্বক্ষণ তাকে পীড়ন করে। নতুন চাকরিটার কথা পার্থকে জানাবার অন্য মনটা ছট্‌ফট্ করে কিন্তু কেন যেন কিছুতেই বলতে পারে না।

একটা সংকোচ, একটা দ্বিধা যেন কণ্ঠরোধ করে তার।

দিন দশেক বাদেই একদিন সন্ধ্যার দিকে অফিস ফেরতা ডাঃ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেই ডাক্তার বলেন, এই যে মিস্ রয় আসুন—ভেলোরের ব্যবস্থা আমি করেছি—সীট পাওয়া গিয়েছে।

পাওয়া গিয়েছে সীট?

হ্যাঁ—

কবে যেতে পারবে ও তাহলে?

যেদিন আপনি পাঠাতে পারবেন। তবে যত তাড়াতাড়ি পারেন ব্যবস্থা করতে, ততই ভাল—

ঠিক আছে এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাঠাবো—

এতদিন মীনাক্ষী কোন কথা বলে নি ভেলোর সম্পর্কে পার্থকে—কিন্তু ঠিক করেছিল আজ বলবে।

ফলের রসটা তৈরী করে পাশের ঘরে এসে ঢুকল মীনাক্ষী।

এগিয়ে ধরে ফলের রসটা সমেত পার্থর দিকে, নাও—

ফলের রস ভর্তি কাপটা হাতে নিয়ে তাকায় পার্থ মীনাক্ষীর মুখের দিকে। তারপর রসটা পান করে শূন্য কাপটা পাশে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল কিন্তু মীনাক্ষী সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল।

পাশের ঘরে ভৃত্যের সাড়া পাওয়া গেল। সে ফিরেছে।

কাপটা ধুয়ে রেখে এসে পাশে দাঁড়ায় মীনাক্ষী পার্থর।

পার্থ—

বল।

আজ ডাঃ সর্বাধিকারী বলছিলেন—

কি ?

ভেলোর পাঠাতে চান তিনি তোমাকে কি একটা অপারেশনের জন্য—

অপারেশন—

হ্যাঁ—সেটা হলে এবং তারপর যদি কিছু দিন কোন হিল ষ্টেশনে থাকতে পার ত একেবারে ঠিক আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি—a new life.

ডাঃ বলেছেন ?

হাঁ, তাই আমি ঠিক করেছি—

কি ঠিক করেছো ক্যামেলিয়া ?

তোমাকে ভেলোরে পাঠাব আমি—

তুমি পাগল ক্যামেলিয়া-

মানে !

নয়ত কি —জান তার কত খরচ —

জানি !

জান !

জানি বৈকি—তা আর কি হবে —প্রয়োজন যখন, খরচের কথা ভাবলে চলবে কেন !

তারপর ?

কি তারপর ?

কিন্তু অত টাকা আসবে কোথা থেকে ? পার্থ বলে।

আবার টাকার ভাবনা ভাবছো তুমি— আমি ত আছি—

তা আছো—তবে প্রত্যেক কিছুরই একটা সীমা আছে—

সীমা ? মীনাক্ষী তাকায় পার্থর মুখের দিকে।

হ্যাঁ—তুমি আমার জন্য আজ অবধি যা করেছো জানি না তার জন্য আমার কি পুণ্য জমা ছিল ক্যামেলিয়া—

পার্থ ?

হ্যাঁ—কিন্তু আরতো অত্যাচার করতে পারব না তোমার উপর—তবে তুমি যখন চাও আমি যাই ভেলোরে, একটা কাজ করা যেতে পাবে—

কি শুনি ?

আমার যে গানগুলো রেকর্ড কম্পানীতে আছে—সেগুলোর কপি রাইট বিক্রী করে দেবো ভাবছি কম্পানীকে—

সে কি—কপিরাইট বিক্রী করবে কি তোমার গানের—না—তা হবে না—

কিন্তু তাছাড়া কত কষ্ট হবে তোমার টাকার জোগাড় করতে ভেবে দেখ—

মানাক্ষা কি বলতে যায় কিন্তু তাকে বলতে দেয় না পার্থ। বলে, বাধা দিও না আমায় ক্যামেলিয়া—কোন ক্ষতি হবে না ওতে ভাল যদি সত্যিই আবার কোন দিন হয়ে উঠি—আবার নতুন গান গাইব—

না—তা হতে পাবে না—

কিন্তু ক্যামেলিয়া—

তোমাকে আমি একটা কথা বলিনি—আমি দিন কয়েক হলো একটা পার্টটাইম চাকরি নিয়েছি—মাইনা চারশ টাকা মাসে—

চারশ টাকা মাইনার পার্টটাইম চাকরি—বল কি! বিস্ময়ে যেন একেবারে অভিভূত পার্থ।

হ্যাঁ—অবিশ্যি আমার অফিসের বস্ মিঃ কুলকারনীর চেষ্টাতেই বোধহয় চাকরিটা পেয়েছি—কারণ তাঁকে বলেছিলাম কথাটা—

কিন্তু চাকরিটা কি?

ডেসপ্যাচ বা করস্পন্ডেন্ট ক্লার্কের চাকরি বলতে পার—

সে জন্য চারশ টাকা মাইনা—

বিরাট এ্যামেরিকান ফার্ম। দিল্লী-বোম্বাইতে ওদের বিরাট অফিস আছে নাকি শুনেছি—এখানেও কলকাতাতে শীঘ্রই অফিস খুলবে—ভাল একটা বিল্ডিংয়ের সন্ধানে আছে ওরা—এবং সে অফিস খুললে আরো বেশী কাজ করতে হবে—

ঐ পর্যন্তই, আর বিশেষ কোন কথা হলো না ঐ সম্পর্কে।

তারপর কটা দিন মীনাক্ষী পার্থর ভেলোরে যাবার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকে। অফিসের থেকে ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করতে হয় মীনাক্ষীকে, কারণ এক সঙ্গে অনেকগুলো টাকা দরকার। টুকটাক জিনিসপত্রও কেনাকাটা করতে হয়। সেই সঙ্গে কিছু জামা-কাপড়।

মীনাক্ষী স্থিরই করেছে ভেলোর থেকে ওকে কোন হিল ষ্টেশনে পাঠিয়ে দেবে।

ডাঃ সবাধিকারী বলছিলেন নৈনিতালে তার এক মারোয়াড়ী পেসেন্টের বাড়ি আছে একেবারেই লেকের ধারে—সেখানেও সে গিয়ে থাকতে পাবে, তবে খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর খরচ নিজেকেই বহন করতে হবে। এবং মীনাক্ষীও ইচ্ছা করলে মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে।

মীনাক্ষী বলেছে ডাঃ সবাধিকারীকে তিনি যেন সেই ব্যবস্থাই করেন—কোন স্যানাটোরিয়াম হলে সে সুবিধা হবে না—তাছাড়া খরচ একটু বেশী পড়লেও সে এখন আর অতটা ভাবছে না, ভাল একটা চাকরি যখন পেয়ে গিয়েছে।

দেখতে-দেখতে যাওয়ার দিন এসে গেল।

সে দিনটা রবিবারও ছিল—কাজেই অফিসের তাড়া ছিল না।

বেলা আড়াইটায় ট্রেন। মাদ্রাজ মেল।

একটা ফার্স্টক্লাশ বার্থ রিজার্ভ করেছিল মীনাক্ষী পার্থর জন্য। বিছানা পেতে বার্থের 'পরে ভাল করে গুছিয়ে শুইয়ে দেয় পার্থকে মীনাক্ষী। ভৃত্য ত সঙ্গে যাচ্ছে—পরে ফিরে আসবে।

বেশী কিছু না—মীনাক্ষী বলে, বেশী কথা লিখতে হবে না শুধু এক ছত্র লিখবে ভাল আছি—ব্যস, সপ্তাহে অন্তত দু'খানা চিঠি দেবে।

পার্থ, মৃদুমৃদু হাসে।

হাসছো কি—ভুল না কথাটা। নইলে আমি এখানে টিকতে পারব না—

জানি!

জানো?

জানি বৈ কি! তারপরই একটু থেমে পার্থ বলে, একটা কথা কয়দিন ধরেই কি আমার মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া?

কি—

ভাল হবো কিনা জীবনে আর জানি না—তবে—

আবার—আবার ঐ সব বাজে কথা! কৃত্রিম ধমক দিয়ে ওঠে মীনাক্ষী পার্থকে।

সত্যিই—বাধা দিও না আমাকে ক্যামেলিয়া আজ বলতে দাও—তোমার এই চেষ্টা সফল হোক আমিও মনে মনে কামনা করি—ভাল হয়ে উঠতে আবার আমিও চাই। এই পৃথিবীতে এই যে সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় অবিচ্ছিন্ন জীবনধারা এর মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এদেরই মত একজন হয়ে আমিও বাঁচতে চাই—কিন্তু তা যদি নাও হয়, তুমি বিশ্বাস করো কোন আক্ষেপ, কোন ক্ষোভই আমার থাকবে না। দু'হাত ভরে তুমি আমায় যা দিয়েছো ক্যামেলিয়া—সমস্ত বুক ভরে সেটা আমার থাকবে মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত। কি পেলাম

আর কি পেলাম না সে হিসাবের অনেক ঊর্ধ্বে অন্তত সে সান্ত্বনাটুকু আমার থাকবে।

মীনাক্ষীর দু'চোখে জল ভরে আসে।

সে পার্থর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে মুঠো করে ধরেছিল। সেই হাত দুটো তেমনি করেই ধরে থেকে বলে, ডাঃ সর্বাধিকারী বলেছেন—অপারেশনের পর যদি পাঁচ-ছয়টা মাস তুমি কোন হিল ষ্টেশনে থাকতে পার আবার সুস্থ হয়ে উঠবে—। আমি বলছি তুমি দেখে নিও পার্থ নিশ্চয়ই আমরা ঘর বাঁধবো—

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টাধ্বনি পড়লো—

পার্থ বলে, ঘণ্টা পড়লো—আর দেরি করো না, যাও—

প্রথম ঘণ্টা—আরো দু'বার ঘণ্টা পড়বে—শান্ত কণ্ঠে মীনাক্ষী বলে।

পাঁচ দিন পরে প্রথম চিঠি পেল পার্থর মীনাক্ষী।

ক্যামেলিয়া!

আমি মাদ্রাজ পৌঁছেছি। যে হোটেলটায় উঠেছি খুব ভাল হোটেল। নতুন হোটেল—হোটেলের নামটা অশোকা।

দুটো দিন এখানে বিশ্রাম নেবো—তারপর ভেলোর যাবো। বেশীদূর নয়—মাত্র আশি মাইল পথ।

বাসেও যাওয়া যায়—ট্রেনেও যাওয়া যায়। তবু ট্রেনেই যাবো স্থির করেছি মনে।

এখানে কাল রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আজকের সকালটি বড় প্রসন্ন, বড় স্নিগ্ধ।

সেদিন তুমি চলে গেলে গাড়ি থেকে নেমে—গাড়ি ছাড়ল। জানালা দিয়ে দেখলাম একটু একটু করে প্ল্যাটফরমটা মিলিয়ে গেল: প্ল্যাটফরমের 'পরে দণ্ডায়মান তোমার শাড়ির গেরুয়া রঙের অঞ্চল প্রান্তটি ক্রমশঃ একটু একটু করে মিলিয়ে গেল।

মনে হলো যেন জীবনের মধুর অধ্যায়টির 'পরে একটি ছেদ পড়লো।

একটু একটু করে ক্রমশঃ বেলা ঝিমিয়ে আসছে বাইরে দেখতে পাচ্ছি।

একটা দুটো করে অনেকগুলো ছোট বড় ষ্টেশন পার হয়ে এলাম।

বাইরে আলো স্বল্প হতে হতে ক্রমশঃ একেবারে মিলিয়ে গেল।

টেলিগ্রাফের পোষ্ট ও তার ক্রমশঃ ঝাপসা অস্পষ্ট হয়ে যায়—আর দেখা যায় না।

সন্ধ্যার আকাশে সেই তারাটি দেখা দিল—আর সঙ্গে সঙ্গে আমার হারিয়ে যাওয়া সেই সুর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠলো।

মধুপের গুঞ্জন যেন গুন-গুন-গুন-গুন!

পেলাম--খুঁজে পেলাম তোমার সেই গানের সুর। তোমার সমস্ত গানটার সুর গুনগুন করে আমার কণ্ঠে এসে ধরা দিল।

তাড়াতাড়ি কাগজ-কলম বের করে সুটকেশ থেকে লিখে ফেললাম স্বরলিপিটা।

অবিশ্যি সঙ্গে হারমোনিয়ামটা না থাকায় অসুবিধা হয়েছে কিন্তু তবু থামিনি।

শেষ করে তবে কলম থামিয়েছি।

ইতিমধ্যে কত ষ্টেশন পার হয়ে গিয়েছি—কতবার গাড়ি থেমেছে--জানতেও পারিনি যেন।

হঠাৎ যখন খেয়াল হলো তখন অনেক রাত, ট্রেন চলেছে অন্ধকারে।

মনে পড়লো কবিগুরুর সেই কবিতাটি, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার কবিতাটা—কারণ তোমার মুখে কতবার শুনেছি কবিতাটা :

এ প্রাণ রাতের রেল গাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

অসীম আঁধারে
কালী-লেপা কিছু-নয় মনে হয় যারে
নিদ্রার পারে রয়েছে সে
পরিচয়-হারা দেশে।

এই পর্যন্ত—তারপর আর কিছুতেই মনে পড়ে না। একদম ভুলে গেছি যেন। সে কি মর্মান্তিক যাতনা মনে করবার জন্য কিন্তু মনে আর পড়ে না।

জানালা পথে বাইরে তাকালাম।

জানালার কাচটা তোমার কথামত পাছে ঠাণ্ডা লাগে বলে তুলে দিয়েছিলাম সেটা ফেলে দিলাম।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া চোখেমুখে এসে লাগল।

মনে হলো তুমি যেন এসে কানে কানে আমায় কি বলে গেলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাকী লাইনগুলো :

ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে বালি,
পার হয়ে যায় চলি,
অজানার পরে অজানায়
অদৃশ্য ঠিকানায়।
অতি দূর তীর্থের যাত্রী,
ভাষাহীন রাত্রি—
দূরের কোথা যে শেষ
ভাবিয়া না পাই উদ্দেশ॥

আবার দেখছি বাইরে আকাশটার এখানে ওখানে মেঘ জমা হচ্ছে। হয়ত আবার বৃষ্টি নামবে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।

আবার চিঠি দেবো তোমায় ভেলোরে পৌঁছে, কেমন ?

কেমন আছো ?

বেশী খেটো না কিন্তু পয়সার জন্য—সব সইতে পারবো কিন্তু তোমাকে হারানোর ব্যথা কিন্তু সইতে পারব না।

প্রচুর ভালবাসা রইলো।

—পার্থপ্রতীম।

চিঠি পড়ে পড়ে যেন আশা মেটে না মীনাক্ষীর।

বার বার পড়ে আর পড়ে:

দিন পাঁচেক পরে ভেলোরে পৌঁছেও আবার চিঠি দেয় পার্থ।

ভেলোরে পৌঁছেই তোমার চিঠিটা পেলাম ক্যামেলি। আঃ যেন এক মুঠো আনন্দ।

কাল এখানকার মেডিকেল বোর্ড আমাকে প্রাথমিক পরীক্ষা করলেন—এক্স-রে, রক্ত ও স্পুটামের রিপোর্ট দেখলেন।

বুকের সব প্লেট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

রাত্রে সিস্টব ললিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, বোর্ড কি বললো সিস্টার আমার সম্পর্কে?

তারা খুব হোপ্‌ফুল, তুমি নাকি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে লোবেকটমি করলেই। ললিতা বলল।

অপারেশনের দিন এবারে ধার্য হবে আরো কিছু পরীক্ষা, আবশ্যকীয় পরীক্ষার পর।

আমার কি আজ মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া—সুস্থ সত্যিই বোধ-হয় আমি হয়ে উঠবো। আমার ঘরের দরজায় নতুন আলো এসে পড়েছে।...কি সুন্দর আকাশ—কি সুন্দর আলো—আলোর বন্যা—আর সেই আলোয় তোমার প্রফুল্ল সুন্দর মুখখানি দেখতে পাচ্ছি।

কি সৌভাগ্য ছিল আমার জীবনে যে তোমায় পেয়েছিলাম বল ত!

কি তপস্যা ছিল আমার বলত ক্যামেলি—যে তোমার ভালবাসা পেয়েছি আমি।

ক্যামেলি—ক্যামেলি—আমার ক্যামেলিয়া: তোমার পার্থ।

চিঠি পড়ে আর মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায় মীনাক্ষী।

ঠিক সময়ে বলতে গেলে একেবারে পার্টটাইম চাকরিটা তার জুটে গিয়েছে।

ঐ চাকরিটা যদি না হতো এই সময়—পার্থকে হয়ত ভেলোরে পাঠাতেই পারত না। কোথায় পেত অত টাকা।

মাসে মাসে যে টাকার এখন প্রয়োজন পার্থর চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য, কোথা থেকে পেত সেই টাকা এ সময় মীনাক্ষী।

ভগবানই মিলিয়ে দিয়েছেন মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে সেদিন অকস্মাৎ কুলকারনীর অফিস চেম্বারে।

পরে অবিশ্যি মীনাক্ষী একদিন মিঃ কুলকারনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল।

বলেছিল, আপনার সুপারিশ ও সৌজন্যতায়ই মিঃ ফারগুসনের অফিসে চাকরিটা আমি পেয়েছি।

মিঃ কুলকারনী বলেছিল, মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাও—বিরাট কনসার্ণ ওদের—আর মিঃ ফার্গুসনের সু-দৃষ্টিতে যখন তুমি পড়েছো উন্নতির সম্ভাবনাও তোমার প্রচুর—

অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে কাজ করে মিঃ ফার্গুসনের অফিসে মীনাক্ষী—কিন্তু কাজ ত বলতে গেলে কিছুই নয়।

দুটো-তিনটে বা বড় জোর কোন কোন দিন হয়ত চারটে কি পাঁচটা চিঠির নোট অনুযায়ী জবাবটা তৈরী করে টাইপ করে দেওয়া।

চিঠিগুলো পাঠাতেও তাকে হয় না।

ক্লার্ক ঘনশ্যামই সে সব চিঠি মিঃ দোশানীর সই করিয়ে পাঠিয়ে দেয়।

প্রায় দেড় মাস হতে চলল চাকরি করছে মীনাক্ষী কিন্তু আজ পর্যন্ত আর ফার্গুসনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

মিঃ দোশানীর সঙ্গেও একদিন কি দু'দিন দেখা হয়েছে মাত্র।

দেখা হয়—এক ঘরে ঢুকতে দরোয়ান ধনবাহাদুরের সঙ্গে ও ভিতরে ঢুকে ঘনশ্যামের সঙ্গে।

আগে আগে প্রথম কয়েকদিন ঘনশ্যামের সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্তা হতো এখন আর তাও হয় না।

টেবিলের 'পরেই তার ফাইল থাকে—এবং ফাইলের মধ্যে থাকে ইনসট্রাকশন প্রয়োজনীয়—সেই ইনসট্রাকশন অনুযায়ীই সে কাজ করে যায়।

আরো একটা জিনিস তার যেন কেমন লাগে আজ পর্যন্ত—ঘনশ্যাম ব্যতীত আর কাউকে কোন দিন সে অফিসে দেখে নি।

অতবড় একটা বিরাট কনসার্ণের অফিস তা সে যতই ছোট হোক না কেন—তার মতো একজন করেসপনডেন্ট ক্লার্কেরই মাইনা চারশ টাকা কিন্তু সে রকম ত কিছুই তার চোখে পড়ে না।

একা একা বসে বসে সে কাজ করে যায়।

কারো কাছে কোন কৈফিয়ৎ নেই—জবাবদিহি নেই—প্রশ্ন নেই—আদেশ বা নির্দেশ নেই—কাজের প্রশংসাও নেই—অপ্রশংসাও নেই।

ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়েছিল মীনাক্ষী পার্থর অপারেশন হয়ে গিয়েছে।

এবং অপারেশন মোটামুটি সাকসেস্‌ফুলই হয়েছে।

পার্থ তার চিঠিতে লিখেছে :

ক্যামেলিয়া—

অপারেশন হয়ে গিয়েছে—যদিও শুয়েই আছি তবু মনে হচ্ছে যেন নতুন জীবন আবার ফিরে পেতে চলেছি।

নতুন জগতের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি।

আর এর সমস্তটুকু কৃতিত্ব তোমারই। বলতে পার গত জন্মে তুমি আমার কে ছিলে? নিশ্চয়ই এমনিই প্রিয়—এমনিই আপনার জন ছিলে।

তুমি আমার প্রাণদাত্রীই নও শুধু জীবনের নতুন আলোও—যে আলো আজ আমাকে বিধাতার আশীর্বাদের মত শতধারায় সিক্ত করছে।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা ছিল।

কেমন যেন বিষণ্ণ হয়েছিল। দুপুর থেকে টিপটিপ বৃষ্টি।

কাজ করবার মত মন বা মেজাজ কোনটাই ছিল না কিন্তু পরের দাসত্ব—উপায় ত নেই তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মীনাক্ষী জরুরী চিঠিগুলো টাইপ করে যখন শেষ করল তখন বেলা সাড়ে চারটে, তখনই চারদিকে যেন মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

দু' হাতের আঙ্গুলগুলো একটানা টাইপ করে করে তখন টন টন করছে।

খোলা জানালা পথে চারতলার আকাশটার দিকে তাকাল: বাইরে ঝির ঝির বৃষ্টি পড়ছে, সমস্ত আকাশটাই মেঘাবৃত।

হয়ত সারা রাত বৃষ্টি পড়বে।

মনে হয় আজ ফার্গুসনের অফিসে না গেলে কেমন হয়।

সোজা বাড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

মনের মধ্যে ইচ্ছাটা গুন গুন করে ফিরতে থাকে।

চিঠিপত্রগুলো গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী। আর ঠিক সেই সময় টেলিফোন অপারেটার তাকে ডাকে।

মিস রয়—

মুখ তুলে তাকাল মীনাক্ষী। দুটো টেবিল পরেই টেলিফোন অপারেটারের বসবার জায়গা।

তোমার ফোন—

॥ ৯ ॥

মীনাক্ষী কথাটা শুনে একটু যেন বিস্মিতই হয়ঃ তার ফোন! .ক আ্বার তাকে ফোন করবে। তাকে ফোন করবার মত আছেই বা .ক!

খানিকটা শৈথিল্যের সঙ্গেই গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে .নয় মীনাক্ষী, হ্যালো—

মিঃ দোশানী স্পিকিং—আর ইউ মিস রয়?

ইয়েস—বলুন।

মিঃ ফার্গুসন বিশেষ কাবণে তোমার সঙ্গে একবার দেখা কবতে চান—

কোথায়--অফিসে যাবো কি?

না -গ্র্যাণ্ডে এসো—

'গ্র্যাণ্ড হোটেল?'

হ্যা—১১৯ নং ঘব। এখন চারটে বেজে পঁয়ত্রিশ—পাঁচটা .থকে পাঁচটা দশের মধ্যে তুমি গিয়ে পৌঁছাতে পারবে না হোটেলে?

বোধহয় পারব -

Good.

সঙ্গে সঙ্গে ফোনেব কানেকশন কেটে গেল।

হাতঘড়ির দিকে একবাব তাকিয়ে দেখল মীনাক্ষী—টেবিলের পরে অগোছাল কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে ফেলল চটচট।

তারপরই অফিস থেকে বেব হয়ে পড়ল।

ভেবেছিল অফিস থেকে বের হয়ে সোজা সে আজ হোষ্টেলেই ফিরে যাবে।

যাবার সময় নিয়ে যাবে কিছু রজনীগন্ধা—পড়বে বসে সঞ্চয়িতা, কিন্তু তা আর হলো না।

পরের দাসত্ব—মনটা নিজের অজ্ঞাতেই একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়ঃ ছিঃ ছিঃ একি ভাবছে সে।

ফার্গুসন সাহেব দয়া করে চাকরিটা দিয়ে ছিল বলেই না পার্থকে সে ভেলোরে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে পেরেছে এবং সেখান থেকে আবার নৈনিতাল যাবে।

পার্থ আবার সুস্থ হয়ে উঠবে আগের মত।

তাই কি সে মনে প্রাণে চেয়েছিল না।

ফার্গুসন তাকে বাঁচিয়েছে—ঐ পার্টটাইম চাকরিটা সে তাকে না দিলে কি হতো!

অফিসের মাইনার উপর নির্ভর করেই থাকতে হতো।

মীনাক্ষী আস্তে আস্তে হেঁটে চলে।

রাস্তা বিশ্রী ভিজে প্যাচপ্যাচে—টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে—ইতিমধ্যেই চারিদিকে আসন্ন সন্ধ্যায় ও মেঘে মেঘে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

অফিস ফেরতা সব যে যার বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত।

ট্রাম বাস—ট্যাক্সীতে অসম্ভব ভিড় রাস্তায়।

ফুটপাতেও ভিড়ের অন্ত নেই।

এ সময় ট্যাক্সী পাওয়া বা ট্রামে বাসে উঠতে পারা দুঃসাধ্য বললেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না সঙ্গে ছাতাও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে ফুটপাত ধরে মীনাক্ষী।

অফিস থেকে গ্র্যাণ্ড অবিশ্যি খুব বেশী একটা দূর নয়। মিনিট কুড়ি পঁচিশের বেশী লাগা উচিত নয় হেঁটে গেলেও।

চোখেমুখে কপালে এসে বৃষ্টিকণাগুলো ঝিরঝির করে পড়ছে।

কেমন যেন শিরশির করে।

সন্তর্পণে চলতে হয়—পথ কর্দমাক্ত ও পিছল।

চলতে চলতেই হঠাৎ মনে পড়ে মাত্র আজ সকালেই ওখানকার

চিঠি পেয়েছে মীনাক্ষী ঃ পার্থর ষ্টিচ্ কেটে দেওয়া হয়েছে, খুব দ্রুততর ঘা শুকিয়ে উঠছে।

আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে হাঁটাচলা করতে দেবে।

ডক্টর গিবসন জানিয়েছেন—তারা অত্যন্ত hopeful—operation has become successful. এবং চিঠির সর্বশেষ কথা হচ্ছে টাকা। এ মাসে যেন কিছু বেশী টাকা পাঠান হয়।

পার্থর কষ্ট যাতে কোন রকম না হয় সেই কারণেই মীনাক্ষী তার আপত্তি করা সত্বেও ভাল কেবিনে ওর থাকবার ব্যবস্থা করেছে।

কেবিন ভাড়াটা অবিশ্যি একটু বেশী তা আর কি করা যাবে।

টাকা।

এ মাসে অনেকগুলো টাকা ধার শোধ করতে গিয়েছে আগের। হাত একেবারে খালি।

মিঃ ফার্গুসনের অফিসে মাইনা পেতেও এখনো দিন দশেক দেরি।

তাছাড়া এ মাস থেকে তার মাইনে থেকে ১০০৲ টাকা করে কেটে নেবার জন্য সে গত মাসেই বলেছিল মিঃ দোশানীকে।

কথাটা না বললেই হতো।

অগ্রিম মাহিনা নেওয়া সম্পর্কে তাঁরা ত কোন কথাই বলেননি—মিথ্যে কেন সে গায়ে পড়ে বলতে গেল কথাটা।

আরো একটা দুশ্চিন্তা মাথার মধ্যে ইদানীং তার শুরু হয়েছে।

পার্থর ব্যাপার নিয়ে হোষ্টেলে মাসীর সঙ্গে ঝগড়া করে উঠে আসবার পর থেকে হোষ্টেলের খরচাও একটা বাড়তি খরচা।

গত দু'মাসে হোষ্টেল খরচও সে দিতে পারেনি—লাবণ্যদি হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলেছে এ মাসে দেবে—

আর বাইরের এখানে-ওখানেও কিছু কিছু ধার আছে—তারও শোধ কিছু দিতে হবে—

হঠাৎ খানিকটা জলকাদা ওর শাড়িতে ছিটকে দিয়ে গেল পথের দ্রুত ধাবমান একটা ট্যাক্সী।

চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

কাপড়ের দিকে তাকাল -বিশ্রী করে দিয়ে গেল জলকাদার ছিটে পরনের শাড়ীটা।

কিন্তু উপায় কি—এই অবস্থায়ই যেতে হবে।

ঝলমল করছে আলোয়-আলোর রাতের গ্র্যাণ্ড।

লম্বা কার্পেটে মোড়া প্যাসেজ—বহু নরনারীর আনাগোনা। রিসেপসনিষ্টদেব কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল মীনাক্ষী: ১১৯ নং ঘরটা কোথায় আমাকে একটু direction দিতে পার—

বিসেপসনিষ্ট একজন হোটেল-বয়কে ডেকে মীনাক্ষীকে ঘরটা দেখিয়ে দেবার জন্য বললে।

মীনাক্ষী এগিয়ে যায় হোটেল-বয়ের সঙ্গে।

লিফটে করে দোতলা— তারপর সোজা চলে গিয়েছে করিডর —লম্বা টানা—অনেকটা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে আবার।

প্রত্যেক ঘরের মাথায় মাথায় ঘরের নম্বর পিতলের লেটারিংয়ে লেখা।

১১৯ নং ঘর।

পিতলের ইংরেজী ১১৯ নম্বরটা দরজার মাথায় ঝক্‌ঝক্ করছে।

আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

শূন্য খাঁ খাঁ করছে লম্বা টানা করিডরটা যতদূর দৃষ্টি পৌছায়।

দরজার গায়ে মৃদু নক্ করল মীনাক্ষী।

ভিতর থেকে আহ্বান এলো, yes—come in—

নিঃশব্দে ভারী দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে পা ফেলল মীনাক্ষী। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর।

মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট বিছান ঘরের সবটা জুড়ে।

একটি বড় কক্ষকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে মধ্যখানে

একটা সূক্ষ্ম নেটের পর্দা ঝুলিয়ে, এক ধারে সোফা কাউচ—মাঝখানে একটি গোলাকার টেবিল।

অন্যদিকে একটি সিংগল বেড--সুদৃশ্য বেডকভারে ঢাকা--মাথার কাছে ফোন।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা হলো। একটা সোফার উপরে বসেছিল মিঃ ফার্গুসন।

ফার্গুসনের পাশে আর একজন।

দ্বিতীয় লোকটাকে চেনে না মীনাক্ষী। দুজনেরই পরিধানে দামী স্যুট।

ইংরেজীতেই কথাবার্তা হয়।

'এসো—Good evening. ফার্গুসন আহ্বান জানায়।

Good evening—মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তরে বলে মীনাক্ষী।

বোস। Be seated please.

মীনাক্ষী বসল সামান্য ব্যবধানে মিঃ ফার্গুসনের মুখোমুখি।

তারপর তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে মিস রয়?

ভাল।

You are happy in our office?

হাঁা--

Quite comfortable?

হ্যাঁ—

No grievance?

না—

Good--যাক আজ যে জন্য তোমাকে ডেকেছি—একটা কাজ করতে হবে তোমাকে--হ্যাঁ ভাল কথা—হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে যায় ফার্গুসন, তোমার পার্থপ্রতীম কেমন আছে?

Thanks—so kind of you—সে ভালই আছে--খুব rapid improve করছে—

তা হলে ত সত্যিই খুব সুখবর—কবে যাচ্ছো তাকে দেখতে—

সামনে পূজোর সময় যাবো ভাবছি—

মৃদু হেসে মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মিঃ ফার্গুসন প্রশ্ন করে—খুব ভালবাস তাকে তুমি মিস রয়, না?

মীনাক্ষী মাথা নীচু করে। মুখটা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

মৃদু হাসে মিঃ ফার্গুসন তারপর বলে, শোন মিস্ রয়—তোমার কাজে আমরা অত্যন্ত খুসি। এখন দেখছি তোমাকে চিনতে সেদিন আমি ভুল করি নি—এও তোমাকে বলে রাখছি—আমাদের দ্বারা যদি কোন সাহায্য তোমার হয়—

So kind of you মৃদুকণ্ঠে মীনাক্ষী বলে।

যাক শোন, আজ একটা বিশেষ কাজের জন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি—একটু আগে যা বলছিলাম—

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকাল ফার্গুসনের দিকে।

একবার তোমাকে বম্বে যেতে হবে অফিসের একটা জরুরী কাজে—

বোম্বাই?—

হ্যাঁ—প্লেনে যাবে—অবশ্য সেখানে থাকতে হবে না—next return প্লেনেই তুমি কলকাতায় আবার ফিরে আসবে—পারবে না—

আমি—মানে—

কথাটা তাহ'লে তোমাকে খুলেই বলি কাজটার জন্য যাকে আমাদের পাঠাবার কথা ছিল হঠাৎ সে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে তারপর আমরা ভেবেছিলাম মিঃ দোশানীকেই পাঠাবো কিন্তু সে অন্য একটা কাজে অফিসে আটকা পড়েছে—তাই মনে হলো তোমার কথা। দোশানীও অবিশ্যি তোমাকেই রেকমেণ্ড করল—পারবে কি বল, অবিশ্যি nothing so difficult—

॥ ১০ ॥

মীনাক্ষী মিঃ ফার্গুসনের প্রস্তাবে কেমন হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে গিয়েছে।

ঠিক কি জবাব দেবে—হ্যাঁ—না—না যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, তোমাকে যেন চিন্তায় ফেললাম মনে হচ্ছে—শোন মিস রয়—এ কাজের জন্য অবিশ্যি তোমাকে একটা স্পেশাল এলাউন্স দেওয়া হবে। এবং তুমি যদি ইচ্ছে কর ত সেটা অগ্রিমই নিতে পার—

মিঃ ফার্গুসনের পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবারে ফিস্‌ফিস্ করে চাপা গলায় মিঃ ফার্গুসনকে যেন কি বলল।

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, তুমি কাজটা না পারলে হয়ত আমাদের একটু অসুবিধাতেই পড়তে হবে মিস রয়—এবং অন্য কারও কথা ভাবতে হবে বাধ্য হয়ে। তবে ভেবেছিলাম তুমি হয়ত রাজী হবে—

কি করতে হবে আমাকে ?

এতক্ষণে আস্তে আস্তে বলে মীনাক্ষী।

খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয় মিস্ রয়—একটা জরুরী এবং বিশেষ important চিঠি—

চিঠি!

হ্যাঁ—একটা জরুরী important চিঠি আমরা ডাকে বা এয়ার মেলে—

মীনাক্ষী চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

ফার্গুসন বলে, পাঠাতে চাই না—সেটা তোমায় বম্বে এয়ার-পোর্টে লোক থাকবে তার হাতে পৌঁছে দিতে হবে মাত্র—

বেশ—কবে যেতে হবে ?

করে কি—to-day মানে to night—এখন পৌণে সাতটা—say রাত নটায় প্লেন, তুমি—

নটায় প্লেন !

হ্যাঁ—বাসায় যাওয়ার কথা ভাবছো কিন্তু তার কোন প্রয়োজনই নেই—তুমি এখান থেকেই সোজা রওনা হবে। অবিশ্যি ইচ্ছে করলে তুমি যেখানে থাক—তোমার সেই হোস্টেল সুপারিনটেনডেণ্টকে জানাতে পার—ফোনে।

কিন্তু আমি—

শোন মিস রয়—We have no time to loose—you must get ready yourself—

কিন্তু একবার হোস্টেলে না গেলে—

কিন্তু তারও সময় নেই—

কিন্তু আমার এই পোশাকটা অন্তত:—

সে জন্য তুমি ভেবো না। পোশাক তোমাকে এখান থেকেই সাপ্লাই করা হবে—

এখান থেকে—

হ্যাঁ শোন, এর মধ্যে আর একটু কথা আছে—একটু আগে তোমাকে বলছিলাম না যাকে দিয়ে আমরা চিঠিটা পাঠাব ভেবেছিলাম সে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে—সে একজন আমাদের বিশেষ পরিচিত এয়ার হোস্টেস্—মিস লায়লাবানু—এখন যার হাতে চিঠিটা দিতে হবে—সেও জানে লায়লাবানুই তাকে চিঠিটা delivery দেবে—

কিন্তু—

বুঝতে পারচি তুমি কি ভাবচো—না—তিনি ইতিপূর্বে লায়লাকে দেখেছেন যদিও একবার, তবু তোমাকে তিনি কোন রকম সন্দেহ করবেন না।

তোমার কথাটা ঠিক্ আমি বুঝতে পারচি না মিঃ ফার্গুসন—

কি জান মিস্ রয়—আমরা চাই লায়লার পরিচয়েই তুমি বম্বে এয়ার পোর্টে গিয়ে চিঠিটা delivery দেবে—

কিন্তু তিনি ত বললেন লায়লাকে দেখেছেন—

হ্যাঁ—

তাহলে—

ফার্গুসন মৃদু হাসে।

তাছাড়া আমি আর একজনের ছদ্ম পরিচয়ে যাবোই বা কেন। Why—

বললাম ত চিঠিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অফিসের একটা বিশেষ ব্যাপার—যে কারণে এ কাজের ভারটা চট্ করে অন্য কাউকে দিতে পারছি না আমরা—তাছাড়া লায়লাকে চিনলেও তোমায় সন্দেহ করবেন না—

মানে—কি বলছেন আপনি—

চিঠিটা politically পরে বলছি কেন—তার আগে জেনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের গুপ্তচরেরা সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে; যদি তারা কোনক্রমে ব্যাপারটা জানতে পারলে বিশেষ ক্ষতি হবে—শুধু আমাদের দেশের নয় তোমাদের দেশেরও—

সে ভদ্র লোকের কথা ছাড়াও অন্য কেউ যদি আমায় চিনে ফেলে যে আমি সত্যিই লায়লাবানু নই—

চিনতে পারবে না—কারণ you look exactly like লায়লা বানু—

What do you mean—?

Here you are—দেখ—মিলিয়ে নাও—বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন একটা আইডেনটিটি কার্ড মীনাক্ষীর দিকে এগিয়ে ধরল।

কেমন যেন বিহ্বল, কেমন যেন হতচকিত মীনাক্ষী।

অবশ হাতে আইডেনটিটি কার্ডটা সামনে খুলে ধরল এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেন চমকে ওঠে।

আশ্চর্য!

এও কখনো সম্ভব! হুবহু সে—অবিকল সে। অন্যে ত দূরে থাক—সে নিজেই ত আইডেনটিটি কার্ডের মধ্যস্থিত ফটোর সঙ্গে তার নিজের এতটুকু পার্থক্য কোথায়ও খুঁজে পাচ্ছে না।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে মীনাক্ষী—

মিঃ ফার্গুসন আবার বলে, আশা করি বুঝতে পারছো এখন সব ব্যাপারটা—নাও আর দেরি করো না—আমাদের হাতে খুব কম সময় আর আছে—পাশের ঘরে যাও—লায়লার একসেট্ পোষাক ও ঘরে আছে চট্ পট্ পরে নাও। Get yourself dressed up - quick—যাও—

ঘরের মধ্যে নজরে পড়ল মীনাক্ষীর ইলেকট্রিক ক্লক্‌টা। কাঁটাটা তার নিঃশব্দে সময়ের ঘরগুলো যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

সাতটা বেজে পাঁচ।

যাও—পাশের ঘরে যাও, ভাল কথা- just a minute - এই নাও তোমার স্পেশাল এলাউন্সটা—এই খামের মধ্যে পুরো টাকাটাই আছে- and this your air ticket.

অবশ শিথিল হাতে সেই নোটভর্তি খামটা ও এয়ার টিকিট এবং পাশপোর্টটা নিয়ে শিথিল গতিতে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল মীনাক্ষী।

ছোট একটা এন্টিরুম।

সামনেই একটা প্রমাণ সাইজের আয়না ফিট করা ড্রেসিং টেবিল।

একশ পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে—তারই আলোয় ছোট ঘরটা যেন ঝলমল করছে। পাশেই একটা চেয়ারের উপরে কিছু জামা-কাপড় রাখা।

উঃ কি প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে মীনাক্ষীর। গলা থেকে বুক পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ নজরে পড়লো—ড্রেসিং টেবিলের উপরে এক গ্লাস জল কাচের সুদৃশ্য একটা ঢাকনী দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

এক মুহূর্ত সেই জলভরা গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিয়ে মুখে দিল—চোঁ চোঁ করে এক টানে জলটা বেশ খানিকটা পান করবার পর যেন মনে হলো জলটার আস্বাদ কেমন একটু টক্ টক্ —মিষ্টি মিষ্টি—

একবার মনে হলো এমন আস্বাদ কেন! কিন্তু সে বুঝি মুহূর্তের জন্য—পরক্ষণেই পিপাসার্ত মীনাক্ষী গ্লাসের সমস্ত জলটা নিঃশেষ করে ফেলে।

আঃ!

পরের চাকরি—যা বলবে তা করতেই হবে। তাছাড়া মন্দ কি —যদি সামান্য একটু কাজের জন্য অতগুলো টাকা উপরন্তু পাওয়া যায়।

টাকা—অনেক টাকার দরকার তার।

আজই ত সে অফিসে বসে বসে ভাবছিল টাকার কথা। কোথা থেকে টাকার জোগাড় করবে।

কেমন করে করবে।

পার্থকে টাকা পাঠাতে হবে হাসপাতালে, এদিককার দেনা মিটাতে হবে—তাছাড়া মন্দ কি একটা প্লেনট্রিপও দেওয়া হবে। জীবনে এমন করে প্লেনে চড়ার সুযোগ আসবে কখনো সে কি কল্পনাতেও ভেবেছিল?

নাঃ আর ভাববে না।

শরীরটা বেশ লাগছে। বেশ ঝরঝরে—বেশ একটা খুশি খুশি ভাব।

কিন্তু ড্রেস পরতে গিয়ে আবার একবার যেন থম্‌কে যায়। এয়ারহোষ্টেসের ড্রেস—

এই পরতে হবে নাকি তাকে!

হ্যাঁ—তাই হয়ত—সে ত আর মীনাক্ষী রায় হয়ে যাচ্ছে না—যাচ্ছে লায়লা বান্নু হয়ে, এয়ার হোসটেস্, মিস্ লায়লাবান্নুর পরিচয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য—অবিকল তারই মত দেখতে।

হঠাৎ মনের মধ্যে মীনাক্ষী বেশ একটা রোমাঞ্চ—একটা উত্তেজনা বোধ করে এ যেন রীতিমত একটা এ্যাডভেঞ্চার—

মৃদু হেসে পোশাক তুলে নেয়।

বদলে গেল—একেবারে সম্পূর্ণ যেন পাল্টে গেল চেহারায় মীনাক্ষী নূতন পোশাকে। এয়ার হোসটেস্ একজন সে এখন।

আয়নায় নিজেকে দেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

দরজার ও-পাশ থেকে মিঃ ফার্গুসনের তাগিদ শোনা যায় আবার, মিস রয় হলো?—we are in hurry—

এই যে আসছি—

মীনাক্ষী বের হয়ে এলো।

মীনাক্ষী নয় এয়ার হোসটেস্ লায়লা বানু।

মিঃ ফার্গুসন ওর দিকে বারেক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠে—Ah! that's very nice—fine—now no more delay—চল নীচে—our car is ready—

১১৯ নং ঘর থেকে বের হয়ে অতঃপর লম্বা করিডরটা পার হয়ে লিফটে করে মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে নীচে চলে এলো মীনাক্ষী।

মিঃ ফার্গুসনের সেই গাড়িটা অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। সেই শাদা রঙের এ্যামেরিকান লাকসারী কারটা।

হোটেলের উর্দী পরা দরোয়ানই সসম্ভ্রমে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

Get in—মিঃ ফার্গুসন বলে।

মীনাক্ষী গাড়ীতে ওঠে।

Here is your bag—মীনাক্ষীর ব্যাগটা এগিয়ে দেয় মিঃ ফারগুসন: এটা টেবিলের 'পরে ফেলে এসেছিলে।

সত্যিই তাড়াতাড়িতে ফেলে এসেছিল মীনাক্ষী—মনেও নেই।

তাহলে—good night. ও তোমাকে পৌঁছে দেবে airportএ—

আর চিঠিটা মিঃ দোশানী will handover you in the airport—এয়ার পোর্টেই তুমি পাবে—

গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

Good night.

গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়—মিঃ ফার্গুসনের কণ্ঠস্বরটা শেষ বারের মত শোনা যায়।

আলোকোজ্জ্বল অভিসারিণী যেন কলকাতা মহানগরী।

লাল নীল সবুজ—নানা রঙের আলোয় আলোয় যেন স্বপ্নের রামধনু রচনা করে চলেছে।

বিচিত্র যানবাহন ও পথিকজনের ভিড়।

বহু বিচিত্র শব্দতরঙ্গের ভিতর দিয়ে দামী এ্যামেরিকান লাকসারী কারটা নিঃশব্দে যেন হাওয়ার বেগে দমদম্ এয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলে।

সুদক্ষ চালক মনসুর।

অতি কৌশলে হাওয়ার বেগে গাড়ি যেন ড্রাইভ করছে।

আঃ মাথাটা যেন অসম্ভব হালকা।

কেমন একটা ঘুম-ঘুম আসে চোখের পাতায়। মাথাটা হেলিয়ে দেয় মীনাক্ষী গাড়ির নরম ব্যাকে।

সামনেই গাড়ির ড্যাস্ বোর্ডে সবুজ আলোটা যেন একখণ্ড পান্নার মত জ্বলজ্বল করছে, পান্না নয় যেন কার একটি চোখ বুঝি।

চেয়ে আছে মীনাক্ষীর দিকে।

মীনাক্ষীর ঘুম পাচ্ছে।

॥ ১১ ॥

ঘুম এসে গিয়েছিল।

একটা মৃদু ঝাকুনী—গাড়িটা এয়ারপোর্টে ঢুকছে দেখতে পেল মীনাক্ষী। সোজা হয়ে ও বসে।

এয়ারপোর্টে তাহলে পৌঁছে গিয়েছে।

একটা আলোর সংকেত অন্ধকার রাতের আকাশে এদিক থেকে ওদিক থেকে থেকে ঘুরছে।

গাড়িটা এসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের সামনে দাঁড়াল।

মীনাক্ষী নামল।

আর নামার সঙ্গে সঙ্গেই ওর কানে মাইকের ঘোষণা এলো: attention please—this is Indian Air-lines Corporation. —attention please. মিস্ লায়লা বানু-এয়ার হোসটেস্ তাকে রেস্তোরাঁর মধ্যে জনাব গুলাম আলি ডাকছেন—

মীনাক্ষীর প্রথমটায় কথাটা যেন ঠিক মর্মে প্রবেশ করেনি। সে যে এয়ার হোস্টেস্ লায়লা বানুর ছদ্ম পরিচয়ে এখানে এসেছে বম্বের যাত্রী হয়ে—সে যে মীনাক্ষী রায় এখন আর নয়, কথাটা যেন তার মস্তিষ্কে ঠিক থিতোয় না হঠাৎ।

কিন্তু আরো দু'বার ঐ একই ঘোষণাটা শোনবার পর হঠাৎ যেন ব্যাপারটা তার মনে পড়ে যায়।

মনে পড়ে যায়: সে এই মুহূর্তে মীনাক্ষী রায় নয়—লায়লা বানু!···সে বম্বে চলেছে অফিসের বিশেষ একটা কাজে এয়ার হোসটেস্ লায়লা বানুর পরিচয়ে।

লায়লা বানুর পরিচয় আইডেনটিটি কার্ড তার কাছে।

লাউঞ্জের এদিকে ওদিকে সব নানা দিকের যাত্রীরা ছড়িয়ে রয়েছে।

কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে—কেউ বা ঘুরছে।

কেউ গল্প করছে, কেউ কিছু পড়ছে --সবাই যে যার নিজেকে নিজে নিয়ে ব্যস্ত। কারোদিকে নজর নেই—দেবার মত ফুরসুৎও নেই।

কিন্তু রেস্তোরাঁটা কোথায়!

এয়ারপোর্টেরই ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসারকে শুধাল মীনাক্ষী, রেস্তোরাঁটা কোথায়?

অফিসারটি দেখিয়ে দিলেন।

এগিয়ে চলে মীনাক্ষী রেস্তোরাঁর দিকে।

কিন্তু জনাব গুলাম আলিকে ত চেনে না মীনাক্ষী। জীবনেও ত তাকে সে দেখেনি। লম্বা না বেঁটে—রোগা না মোটা—ফর্সা না কালো কে জানে! তাছাড়া মিঃ দোশানীর চিঠিটা দেবার কথা—তিনিই বা কোথায়—

রেস্তোরাঁর মধ্যে সুইংডোরটা ঠেলে প্রবেশ করল মীনাক্ষী।

বহু নরনারী রেস্তোরাঁয় বসে কেউ আহার করছে, কেউ চা বা কফি পান করছে—ওয়েটাররা চারিদিকে কর্মব্যস্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে এদিক ওদিক তাকায় মীনাক্ষী।

এনকোয়ারীতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসবে নাকি।...হঠাৎ একজন বৃদ্ধ বেঁটে মত লোক পাশে এসে দাঁড়াল।

দামী স্যুট পরিধানে—মাথায় ফেল্ট্‌ ক্যাপ।

মুখে পাইপ।

কানের কাছে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে, মিস্‌ লায়লা—

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের দিকে চম্‌কে ফিরে তাকাল মীনাক্ষী।

হ্যাঁ—আপনি—

গুলাম আলি—আপনার চিঠিটা--বলতে বলতে একটা পেঙ্গুইন সিরিজের ক্রাইম নভেল এগিয়ে দিল লোকটা।

হাত বাড়িয়ে বইটা নেয়।

চিঠির বদলে বই—কিন্তু কিসের চিঠি—কার চিঠি ব্যাপারটা ঠিক

বোধগম্য হয় না মীনাক্ষীর এবং সেই কথাটাই বোধ করি বলবার জন্য মুখ তুলে সামনে তাকায়।

কিন্তু সে ভদ্রলোককে কোথায়ও আশেপাশে দেখতে পায় না।

হাওয়ায় যেন উবে গিয়েছে আগন্তুক।

আশ্চর্য! গেল কোথায় লোকটা। কিন্তু সে কথাটাও ভাববার সময় পায় না মীনাক্ষী।

মাইকে তখন এনাউন্স করছে—৭০৭ বোয়িংয়ের প্যাসেঞ্জারদের কাষ্টমসের দিকে যাবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি টিকিট চেকিং কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়।

টিকিটটা চেকিং হয়।

এক সময় একে একে গিয়ে সব প্লেনে ওঠে।

৭০৭ বোয়িং বিরাট আকাশপাখী ঝাপসা আলোছায়ার মধ্যে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

এয়ার হোষ্টেস্ দরজা খুলে একে একে যাত্রীদের স্বাগত জানায়।

সিঁড়ি বেয়ে যাত্রীরা এক এক করে বিরাট সেই আকাশপাখী ৭০৭ বোয়িংয়ের গহ্বরে প্রবেশ করে।

যথা সময়ে দরজা বন্ধ হলো।

ইঞ্জিন চালু হলো।

তারপর নড়ে উঠলো আকাশপাখী।

আকাশ মরাল ডানা মেলল মেঘলোকে।

এয়ার হোষ্টেসের গলা শোনা যাচ্ছেঃ Ladies & gentlemen—৭০৭ বোয়িং আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে এই আকাশ যাত্রায়—

কাচের জানালা পথে নীচের দিকে তাকাল।

রাতের কলকাতা শহর ক্রমশঃ বিলীয়মান। আর অসংখ্য যেন মাটির প্রদীপ মিটি মিটি জ্বলছে।

মহানগরীতে যেন দীপান্বিতার উৎসব।

এতক্ষণ হাতের বইটা ধরাই ছিল—মনেও ছিল না যেন মীনাক্ষীর বইটার কথা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল বইটার কথা।

বইটার পাতা উল্টাতেই পেল একখানা মুখ আঁটা খাম। কিন্তু খামের 'পরে যে নাম ঠিকানা টাইপ করা সে ত তার অত্যন্ত পরিচিত।

মাত্র একদিন আগে ভিতরের চিঠিটা ও খামটা টাইপ করে সেই ত মিঃ দোশানীর টেবিলের 'পরে রেখে এসেছিল।

পিকিংয়ের সঙ্গে একটা বিজনেস করেসপনডেন্স।

আসাম টি গার্ডেনস্ থেকে চা যাবে পিকিংয়ের একটা বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে, তারই সব প্রয়োজনীয় কথাবার্তা।

এ চিঠিটা এমন কি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ যে তাকে এভাবে পাঠানো হলো চিঠিটা পৌঁছে দেবার জন্য!

অনায়াসে যে চিঠিটা ডাকে আসতে পারত—সে চিঠিটার জন্য তাকে রাতারাতি স্পেশাল এলাউন্স্ দিয়ে অন্যের পরিচয়ে প্লেনে পাঠাবার এমন কি প্রয়োজন ছিল।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় মীনাক্ষী।

সে মীনাক্ষী রায়—লায়লা বানুর পরিচয় নিয়ে বম্বে চলেছে।

ব্যাগ থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করল মীনাক্ষী।

আশ্চর্য!

লায়লা বানু যেন অবিকল সে। লায়লা বানু ও মীনাক্ষী রায় যেন যমজ দুটি বোন। এমনটা কেমন করে হয়—কেমন করে সম্ভব!

অন্যমনস্কভাবে টাকার খামটা খোলে—নতুন আনকোরা একেবারে একশ টাকার নোট—কি খেয়াল হয় নোটগুলো গুণতে গিয়ে দেখে যা দেবার কথা ছিল তাত নয়—তার চাইতে যে অনেক বেশী টাকা।

হাজার টাকা। কড়কড়ে হাজার টাকার নোট, একশ টাকার দশখানা নোট।

মীনাক্ষীর গুণতে ভুল হয় নি ত?

আবার সে গুণল—বার বার তিনবার গুণল—নাঃ ভুল হয় নি—পুরো হাজার টাকাই আছে।

কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে মীনাক্ষীর।

কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কোথা থেকে একটা সংশয় আর সন্দেহের ধোঁয়া যেন মনের মধ্যে ক্রমশঃ জমাট বেঁধে উঠছে।

আগাগোড়া আজ গত দুমাসের সমস্ত ব্যাপারগুলো যেন একটার পর একটা মনের পাতায় ভেসে উঠতে থাকে।

চারশোটাকা মাইনার পার্টটাইম চাকরি—তাও যেন কতকটা সেধেই তাকে দেওয়া হয়েছে—

তারপর সেই ছোট্ট কলকাতার অফিসটা—বিচিত্র ঘনশ্যাম—

চন্দ্রকান্ত—এবং মিঃ ফার্গুসন লোকটা—এবং সর্বশেষে আজকে আর একজনের পরিচয়ে এয়ার হোসটেস্ সেজে একটা বিচিত্র চিঠি নিয়ে delivery দেবার ব্যাপার যেজন্য তাকে কড়কড়ে নগদ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

কেমন যেন এতক্ষণে ভয় ভয় করতে থাকে মীনাক্ষীর।

অজ্ঞাতে একটা ভয় যেন মাকড়শার মত রোমশ পা ফেলে ফেলে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

তাকে যেন গ্রাস করতে উদ্যত। চোখ দুটো বোজে মীনাক্ষী, আর এক সময় আবার ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে।

চারিদিকে একবার চোখ বোলাল মীনাক্ষী—সব প্যাসেঞ্জারই প্রায় যে যার আসনে নিজেকে ঘুমের মধ্যে এলিয়ে দিয়েছে।

ঘুম নেমে এসেছে প্লেনের মধ্যে।

মীনাক্ষীর চোখে কিন্তু ঘুম আসে না।

মাথার মধ্যে একটা চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে। একটা দুঃশ্চিন্তার ঝড়। একটা ভয়ের ঝড়।

রাত প্রায় পৌণে বারটায় বিমান এসে বোম্বাই বিমান ঘাঁটিতে ল্যাণ্ড করল।

দেড় ঘণ্টা বাদে আবার বিমান উড়বে।

সব যাত্রীই নামে—মীনাক্ষীও নামে।

বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জে—যাত্রীরা সব এসে জড়ো হয়—তারপর যে যার টিকিট নিয়ে টিফিনের জন্য রেস্তোরাঁয় গিয়ে প্রবেশ করে।

মীনাক্ষী কি করবে বুঝতে পারে না।

এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—একজন বৃদ্ধ এসে দাঁড়াল: মিস্ লায়লা বাসু—

Yes—

চমকে মুখ তুলে তাকাল মীনাক্ষী লোকটার দিকে।

May I have a look in your book—

বোকার মতই যেন মীনাক্ষী হাতের পেঙ্গুইন ক্রাইম নভেলটা চিঠিটা সমেত বৃদ্ধের হাতে তুলে দেয়।

Thanks.

বৃদ্ধ বইটা হাতে করে রেস্তোরাঁর দিকে চলে গেল।

দূরে সেই সময় একটা ক্যামেরার ফ্ল্যাস বাল্ব জ্বলে উঠল ক্লিক্ করে।

যেমন কথা ছিল—ঠিক তেমনি শেষ রাত্রের দিকে আবার ভাইকাউন্টে মীনাক্ষী কলকাতায় ফিরে এলো বোম্বাই এয়ারপোর্ট থেকে।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে ঢুকতেই ড্রাইভার মনস্থুরের সঙ্গে দেখা।

মেম্ সাব গাড়ি এনেছি—

মীনাক্ষী মুহূর্তকাল কি যেন ভাবে। তারপর এগিয়ে ফার্গুসনের শাদা গাড়িটায় গিয়ে উঠে বসে।

গাড়ির পিছনে ঝিম্ দিয়ে বসেছিল মীনাক্ষী।

মনস্থুর নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল।

মেম্ সাব—সাহেব আপনাকে সোজা হোটেলে যেতে বলেছে—মনস্থুর এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলে।

মীনাক্ষীর একবার ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করে কেন? কিন্তু কি ভেবে জিজ্ঞেস করে না কথাটা—চুপচুপ বসে থাকে।

তাছাড়া এই বিচিত্র বেশও তাকে ছাড়তে হবে।

তার শাড়ি হোটেলেই রয়েছে। হোটেলে একবার যেতে হবেই। তাছাড়া কতকগুলো কথা স্পষ্টাস্পষ্টি তার আজ মিঃ ফার্গুসনকে জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন।

যে অজ্ঞাত আশংকাটা বুকের মধ্যে কাল রাত থেকে ছায়া ফেলেছে—সেটারও একটা মীমাংসা হওয়া আশু প্রয়োজন।

টাকার অঙ্কটারও মীমাংসা করা দরকার

সব চাইতে বড় কথা—এই চাকরির ব্যাপারটাই যেন গতকাল

থেকে মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ও আশংকার কালোছায়া ফেলেছে।

যদিও সে বুদ্ধি ও সহজ বিবেচনায় চাকরির মধ্যে দোষনীয় কিছু খুঁজে পাচ্ছে না, তবু এই চিঠি নিয়ে অন্যের ছদ্ম পরিচয়ে—মিথ্যা আইডেনটিটি কার্ড নিয়ে বোম্বাই এয়ার পোর্ট যাওয়ার ব্যাপারটা যেন গতকাল থেকেই মনের মধ্যে বিশ্রী খচ্‌খচ্‌ করে একটা কাঁটার মত বিঁধছে।

ভাল লাগছে না। মোটেই ভাল লাগছে না।

সোজা গাড়ি হোটেলের সামনেই এসে দাঁড়াল এবং মীনাক্ষী গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে গিয়ে প্রবেশ করে।

সেই ১১৯ নং ঘর।

নক্‌ করতেই দরজায়—গত রাত্রির মতো আহ্বান এলো Come in—

মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে পা দেয়—

একাকী মিঃ ফার্গুসন ঘরের মধ্যে বসেছিল—আহ্বান জানায়—Good afternoon Miss Ray, you look tired--এক কাজ কর—have an wash first—যাও বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও—আমি তোমার জন্য কিছু tiffin ও চায়ের কথা বলে—

না মিঃ ফার্গুসন চায়ের বা tiffin-এর দরকার নেই—তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলো কথা আছে—সোজা একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল মীনাক্ষী ফার্গুসনের।

কথা!

হ্যাঁ—

প্রথমেই ব্যাগ থেকে টাকা সমেত খামটা বের করল মীনাক্ষী, এবং খামটা ফার্গুসনের সামনে ধরে বললে, এর মধ্যে হাজার টাকা আছে—

হ্যাঁ—

তাহলে তুমি জানতে?

নিশ্চয়ই। আমিই ত টাকাটা রেখেছি ওর মধ্যে—

কিন্তু হাজার টাকা কেন ?

তোমার প্রয়োজন আছে আমি জানি, তাই টাকাটা দিয়েছি—

কিন্তু—

শোন মিস রয়। Don't get excited—তাছাড়া আমি জানি তোমার মনের মধ্যে এই মুহূর্তে কি হচ্ছে, বোস—be seated please.

মিঃ ফার্গুসন—

মিস্ রয়—একটা বিশেষ কথা যা তোমাকে আমি বলতে চাই sentimentয়ের দাম আছে নিশ্চয়ই কিন্তু বাস্তব জীবনে ঐ sentiment সময় সময় যে আমাদের কত বড় ক্ষতি করে—

বাধা দিল মীনাক্ষী। বললে, শুনুন মিঃ ফার্গুসন—আমারও আজ একটা কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে—

কি মনে হচ্ছে—

আমার চাকরির ব্যাপারটা আগাগোড়াই যেন অস্পষ্ট—ধোঁয়াটে —সামান্য পার্টটাইম করেসপনডেণ্ট ক্লার্ক—তার জন্য চারশ টাকা করে মাইনা—তারপর এই ভাবে একটা মিথ্যা personification-এ একটা চিঠি পৌঁছে দেবার জন্য এতগুলো টাকা—no excuse me মিঃ ফারগুসন—আমি ঠিক—

বুঝে উঠতে পারছো না ত!

হ্যাঁ—

কিন্তু এতে না বোঝার কি আছে—better we should be frank to each other now—দু'জনার কাছেই দু'জনার আমাদের বোধ হয় আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার। অবিশ্যি you are right—তোমার মনে দ্বিধা সন্দেহ জাগতে পারে, খুব natural। আর সেটাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। কথাটা তোমাকে তাহলে খুলেই বলি শোন—

মীনাক্ষী মিঃ ফারগুসনের মুখের দিকে তাকায়।

॥ ১৩ ॥

মিঃ ফারগুসন বলতে থাকে :

বাইরে থেকে আমাদের কাজটা মানে আমাদের অফিসের কাজ খুব সহজ simple মনে হলেও ব্যাপারটা অত কিন্তু সহজ বা simple নয়—ভিতরে অনেকটা গুরুত্ব আছে—তাই আমরা আমাদের চিঠিপত্রের জবাব ও করেসপনডেনসের ব্যাপারে এমন একজনকে খুঁজছিলাম—যার 'পরে আমরা rely করতে পারি—বিশ্বাস করতে পারি—সে জন্য মাইনাও এক্ষেত্রে আমরা অনেক বেশী দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সে রকম কাউকে কিছুতেই পাচ্ছিলাম না—তারপর একদিন মিঃ কুলকারনীর অফিসে তোমাকে আমি দেখি—and you impressed me. মিঃ কুলকারনীকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞেসাবাদ করি—he had highly spoken about you. তোমার সম্পর্কে দেখলাম তার খুব উঁচু ধারণা—

মিঃ ফারগুসন একটু থেমে আবার বলতে লাগল :

তবু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমি select করিনি—I kept an eye on you—দেখলাম যখন তোমার 'পরে আমরা নির্ভর করতে পারি তখনই তোমাকে আমরা মনোনীত করেছি। বুঝতেই পারছো ঐ মাইনায় অনেক ছেলে বা মেয়েই আমি পেতে পারতাম আর পেয়েছিলামও কিন্তু তার মধ্যে থেকে মনে হলো তুমিই উপযুক্ত—তাই তোমাকেই আমি বেছে নিলাম। এবং একথাও নিঃসংকোচে বলব তোমাকে বেছে আমি ঠকিনি। বিশেষ করে কালকের কাজটা তুমি যে ভাবে করে এসেছো—তাতে করে বুঝেছি আমার মনোনয়ন ভুল হয়নি—তোমার 'পরে আমরা অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে পারব—

মনের মধ্যে এতক্ষণ যে বিরূপ ভাবটা মীনাক্ষীর জমাট বেঁধে উঠেছিল সেটা ফারগুসনের কথায় একটু একটু করে লোপ পেতে থাকে।

—কিন্তু, আমি—তবু যেন সংশয়ের পীড়নটা মন থেকে যায় না। মীনাক্ষীর একেবারে মুছে।

মিঃ ফার্গুসন বলেন, তবু বোধহয় তোমার মনে একটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাই না—মৃদু হেসে ফার্গুসন বলে আবার—

Well my child—আমার পরে তুমি বিশ্বাস রাখ—তোমার ক্ষতি হয় এমন নিশ্চয়ই আমি কিছু হতে দেব না—যাও—আজ—আর নয়। আজ তুমি ক্লান্ত—তাছাড়া কিছুটা excited ও—

মীনাক্ষীকে যেন কতকটা জোর করেই মিঃ ফার্গুসন হস্টেলে পাঠিয়ে দেয়।

কিন্তু তারপর দুটো দিনও গেল না—মনটা তখনো মীনাক্ষীর শান্ত হয় নি--সংশয়ের পীড়নটা তখনো মনের মধ্যে চলেছে।

আবার ডাক এলো এক সন্ধ্যায় হোটেলের ১১৯ নং ঘর থেকে।

সেই ১১৯নং ঘর।

আজও মিঃ ফার্গুসন একাই ঘরে ছিল! ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, বে.স—কথা আছে—আগে বল তোমার পার্থর খবর কি?

ভাল, rapidly improving.

Good. Any drink?

No thanks.

তারপরেই মিঃ ফার্গুসন বলে:

শোন—মিস্ রয়, আমরা তোমাকে দু-একদিনের মধ্যেই দিল্লী পাঠাচ্ছি—

দিল্লী—যেন চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

হ্যাঁ—

কিন্তু—আমার চাকরি—

ও চাকরিতে তুমি resign দাও—

Resign দেবো!

হ্যাঁ—তোমাকে আমরা এবার থেকে হাজার টাকা মাইনা ও ফারনিসড্ কোয়ার্টার দেবো—

বলে কি—হাজার টাকা মাইনা—ফারনিসড্ কোয়ার্টার—

ভাবছো হয়ত কি আমি বলছি মিস্ রয়—তাই না? শোন—দিল্লীর গভর্নমেণ্ট হাইসার্কেলের সঙ্গে যাতে তোমার যোগাযোগ ঘটে—সেই ব্যবস্থা আমরা করব—

কিন্তু কেন?

বুঝতেই পারছো business market-এ আজকাল কি দারুণ competetion, তাই এ দেশে business-এ prosper করতে হলে হাইসার্কেলের সমস্ত সংবাদের ব্যাপারে আমাদের সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। We must be upto-date. আর সেটা সম্ভব হবে তুমি যদি ওদের সঙ্গে freely মিশবার সুযোগ পাও। অবিশ্যি সে সুযোগ আমরাই তোমাকে করে দেবো—

তবু যেন মীনাক্ষীর মনে হয় ব্যাপারটা ধোঁয়াটে।

কেমন ঝাপসা—হাজার টাকা মাইনা—ফ্রি ফারনিসড্ কোয়ার্টার—দিল্লীতে অবস্থান—Government high circle-এ মেলামেশা—একটা দ্বিধা একটা সন্দেহ যেন মনের কোথায় অদৃশ্য একটা কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করে বিঁধতে থাকে মীনাক্ষীর।

মন যেন সহজ ভাবে সায় দেয় না।

আমাকে দুটো দিন ভাবতে দাও মিঃ ফারগুসন—ক্ষীণকণ্ঠে কোনমতে বলে মীনাক্ষী।

ভাবতে চাও ভাবতে পার—কিন্তু ভাবনার কিছুই নেই জেনো—listen মিস রয়—সুযোগ মানুষের জীবনে হামেশাই যখন তখন আসে না। এবং সেই সুযোগ আসা সত্ত্বেও যারা তাকে avail করতে পারে না তাদের আমি বোকাই বলব—fools—nothing but fools. Just think—ভেবে দেখো তোমার মত একজন মেয়ের জীবনে এটা সামান্য সুযোগ নয়—rather you could say a golden chance. তাছাড়া তুমি জীবনে বড় হতে চাও না—prosperity—money—comforts চাও না তুমি?

মীনাক্ষী চুপ করে থাকে।

কথা বলতে বলতে ফার্গুসন উঠে দাঁড়াল।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। মীনাক্ষী বসে থাকে।

ফারগুসন বলতে থাকে, তাছাড়া আমি ত জানি তোমার অনেক টাকার দরকার—for yourself এবং তোমার পার্থপ্রতীমের জন্য—

পার্থপ্রতীম—

হ্যাঁ—পার্থপ্রতীমের জন্য--তার অপারেশন successful হয়েছে—কিছুদিনের মধ্যেই তাকে তুমি hill station বা sea side-এ পাঠাতে চাও না?

হ্যাঁ-চাই কিন্তু আপনি—আপনি এসব কথা জানলেন কি করে—

I know—আমি সব জানি! তুমি তাকে কি রকম ভালবাস—সে তোমাকে কি রকম ভালবাসে—কেমন করে তুমি তাকে দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুলেছো—তোমার বুকভরা ভালবাসা দিয়ে অর্থ দিয়ে—I know everything—I know your dreams my child—আমি—জানি তোমার স্বপ্ন আর এও জানি টাকার জন্য তুমি কি ভাবে জড়িয়ে পড়েছো—তাই বলছিলাম—আজ এমন একটা সুযোগ পেয়ে যদি তাকে তুমি ছেড়ে দাও—তোমাকে আমি বোকাই বলব—যাক্ গে—তুমি সময় চাইছিলে—ভেবেই দেখ তুমি দুটো দিন না হয়—দু'দিন ভেবেই না হয় জবাব দিও—but not more than two days—দু'দিনের বেশী নয়—দু'দিন—you can go to day—আজ যেতে পারো--

হোটেল থেকে বের হয়ে এলো মীনাক্ষী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যেই—চারিদিকে শহরের আলো জ্বলে উঠেছে। হাঁটতে শুরু করে কিন্তু হাঁটতেও ভাল লাগে না—একটা ট্যাক্সী ডেকে তাতেই উঠে বসে।

হোস্টেলে এসে দুটো চিঠি পেল মীনাক্ষী।

একটা তার সহকর্মী ও বান্ধবী সরমা লিখেছে :

পার্থকে ভেলোরে পাঠাবার সময় সে সাড়ে তিনশ টাকা ধার নিয়েছিল সরমার কাছ থেকে। সরমার বাবা অসুস্থ—অতএব তার টাকাটা এখন বিশেষ প্রয়োজন—যদি সে টাকাটা দেয় ত বড় উপকার হয় তার—

দ্বিতীয় চিঠিটা পার্থর।

পার্থ লিখেছে :

আমার ষ্টিচ্ কেটে দিয়েছে ক্যামেলিয়া—একটু একটু করে আবার হাঁটছি। ওজনেও বেড়েছি—তুমি হয়ত দেখলে আমায় চিনতেই পারবে না আজ।

এখন মনে হচ্ছে তাড়াতাড়ি—আর যেন দেরি সইছে না। মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি হিল ষ্টেশনে যাবো তত তাড়াতাড়ি যেন সেরে উঠবো। সুস্থ হয়ে উঠবো আর তত তাড়াতাড়ি তোমাকে পাবো।

নৈনিতাল যাবার কথা বলেছিলে—তাইত ঠিক না ?

সত্যি কথাটা ভাবতেও যে কি আনন্দ হচ্ছে !

আমি যখন সেখানে থাকবো তুমি নিশ্চয়ই আসবে—দু'জনে লেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নৌকায় ভাসব, কেমন ?

তোমার লেখা গানটায় যেটায় আমি সুর দিয়েছি তুমি গাইবে —কেমন—

॥ ১৪ ॥

অন্যমনস্ক ভাবে চিঠিটা পড়তে পড়তে বাইরের দিকে তাকাল খোলা জানালা পথে মীনাক্ষী।

আকাশটা চমৎকার নির্মেঘ।

শ্রাবণ শেষ হয়ে ভাদ্র আসছে—তার মানেই আশ্বিন—আশ্বিনেই ত এবারের পুজো।

পুজোর আগেই মনে মনে স্থির করে রেখেছে মীনাক্ষী পার্থকে নৈনিতাল পাঠিয়ে দেবে এবং পুজোর ছুটিটা সেখানে গিয়ে সে কাটাবে।

মুহূর্তের জন্য যেন সব ভুলে যায়—মন থেকে সব মুছে যায় মীনাক্ষীর।

মীনাক্ষী স্বপ্ন দেখে।

অখণ্ড আনন্দ—

সেই আনন্দেরই যেন আগমনী সুর আকাশে বাতাসে।

হ্যাঁ—পার্থকে বাঁচতে হবে—আবার তাকে নীরোগ সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠতে হবে।

দু'জনে তারা আনন্দের একটি ঘর বাঁধবে।

সেখানে আর কেউ নয় শুধু সে আর পার্থ। পার্থ আর সে।

এবং সেজন্য প্রয়োজন অর্থের।

টাকা তার চাই—

টাকা না হলে সে বাঁচতে পারবে না। সে বাঁচতে পারবে না—পার্থকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না।

অতএব আর কোন দ্বিধা নেই—চাকরি সে নেবে।

কেন নেবে না চাকরিটা! কোন অন্যায় ত করছে না সে—কোন পাপও করছে না, তবে কেন চাকরিটা নেবে না।

মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে যায় মীনাক্ষীর।

কাপড়-জামা ছেড়ে স্নান করতে চলল সে বাথরুমে। পথে হোস্টেলের লেডি সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা।

এই যে মীনাক্ষী—এ মাসও ত শেষ হতে চলল—হোস্টেলের ডিউসটা এবারে দেবার ব্যবস্থা কর। বুঝতেই ত পারছো গভর্নমেন্ট হোস্টেল—তিনমাস অন্তর একাউন্টস্ অডিট হয়—

আমি আজই আমার সব dues মিটিয়ে দেবো লাবণ্যদি। আপনি যান আপনার ঘরে আমি আসছি, মীনাক্ষী বলে ফেলে।

ভাল খুব ভাল—বুঝতেই ত পারছো আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে—

টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে আসে সবাগ্রে।

তারপর স্নান করে এসে এক কাপ চা পান করে শয্যায় গিয়ে আশ্রয় নেয় মীনাক্ষী এবং ঘন্টা দুই একটা টানা ঘুম দিয়ে যখন উঠে বসল বেশ রাত হয়েছে—আকাশে মেঘ—শ্রাবণ আকাশ বিষণ্ণ।

সব ধার—যেখানে যা আছে সব শোধ করে দেবে মীনাক্ষী।

ব্যাগ থেকে টাকার খামটা বের করল।

কড়কড়ে হোটেলের দেনা মিটিয়েও এখনো ব্যাগের মধ্যে আটশ টাকা আছে।

মনে মনে হিসাব করে মীনাক্ষী কোথায় তার আর কত ধার আছে।

কিন্তু সব ধার শোধ দিতে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তা না থাকুক—সে যখন মনে মনে স্থির করে ফেলেছে মিঃ ফারগুসনের প্রস্তাবটাই গ্রহণ করছে তখন আর চিন্তা কি।

দিল্লীতে মোটা মাইনা।

পরের দিন অফিসের পরে মরিসন অফিসে যেতেই দোশানীর ঘর থেকে ডাক এলো। এবং মীনাক্ষী কোন কথা বলবার আগে দোশানীই কথাটা তুলল, দু-একটা কাজের কথার পর—শুনলাম মিস্ রয়, মিঃ ফারগুসন তোমাকে better offer দিয়েছে—

হ্যাঁ—

তা তুমি কিছু স্থির করলে নাকি ?

হ্যাঁ—ঠিক করেছি—

কি ?—দোশানী মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকায়। তার দু'চোখে যেন জ্বলন্ত আগ্রহ।

তার offer accept করবো—

Very good—

মিঃ ফারগুসনের সঙ্গে তোমার দেখা হলে কথাটা আমার জানিয়ে দিও মিঃ দোশানী—

নিশ্চয়ই—

পরের দিনই মিঃ দোশানী মীনাক্ষীকে অফিসে ডেকে বললে, মিঃ ফারগুসন হঠাৎ বম্বে চলে গেল—তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তোমার সম্পর্কে। তুমি তাঁর offer-টা accept করেছো বলে সে অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তুমি ইচ্ছে করলে আজ থেকেই তোমার নতুন চাকরিতে join করতে পার—

আজ থেকেই—

Why not—

কিন্তু অফিসে জানাতে হবে ত আমাকে—

সে জন্য এখন তোমাকে ভাবতে হবে না। মিঃ ফারগুসন বলেছে আমাকে যেমন তুমি কাজ করছো এখন আপাততঃ তেমনি কাজ করে যাও সেখানে—ইতিমধ্যে দিল্লীর সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে তুমি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেও শুধু ইতিমধ্যে এক মাসের নোটিশ দিয়ে রাখ তাদের—

মীনাক্ষী ঘাড় নেড়ে বলে, তাই হবে।

দোশানীর পরামর্শ মত পরের দিনই অফিসে গিয়ে একমাসের নোটিশ দিয়ে দিল মীনাক্ষী। এবং ধারও যেখানে যা ছিল শোধ করে দিল। হাত অবিশ্যি খালি হয়ে গেল আপাততঃ, তা হোক। এখনত আর টাকার ভাবনা নেই—।

এক মাস দেখতে দেখতে চলে গেল।

ওদিকে পার্থকেও ভেলোর থেকে ছুটি দিয়েছে—সেও ডাঃ সর্বাধিকারীর ব্যবস্থা মত নৈনিতালে চলে যায়।

ডাক্তার বলে, মীনাক্ষীর ঐ সময়কার ডাইরীটা পড়লে বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে তখন বিচিত্র একটা দ্বন্দ্ব চলেছে।

একদিকে পার্থ আর একদিকে তার স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি। একদিকে ভালবাসা, কর্তব্য পার্থর প্রতি, অন্য দিকে একটা সংশয়ের নিরন্তর পীড়ন।

মেয়েটা যেন সত্যিই একটা দোটানায় পড়েছিল।

॥ ১৫ ॥

সত্যিই তাই—মীনাক্ষীর ইচ্ছে করে সব কথা খুলে লেখে পার্থকে কিন্তু আবার কি ভেবে কোন কথাই লেখে না।

মনে ভাবে—না এখন না। যখন দেখা হবে তখন surprise দেবে। চমকে দেবে পার্থকে। তাছাড়া এত তাড়া হুড়াবই বা কি আছে—পার্থ নৈনিতালে গিয়েছে সেখানে মাস তিন চার থাকতে পারলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

তবে ইতিমধ্যে তাদের বিয়েটা এবার সেরে ফেলতে হবে।

সত্যিই ত বয়স ত কম হলো না তাদেব—আর কবেই বা তারা বিয়ে করবে!

চাকরির ব্যাপারে দিল্লীতে যদি একান্তই থাকতে হয় ত থাকতেই হবে—উপায় কি। নচেৎ এখানে থাকলে কলকাতার বাইরে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নেবে।

ছোট বাড়ি—সামনে একটু বাগান।

শহরের ব্যস্ততা, গোলমাল, ধুলোবালি নেই—বরং খানিকটা গ্রাম্য শান্ত পরিবেশ।

পার্থকে কাজ করতে দেবে না সে।

আর কি হবেই বা পার্থকে কাজ করতে দিয়ে—সেই ত কাজ করছে—মোটা মাইনা পাচ্ছে—তাদের প্রয়োজনের চাইতেও ত অনেক বেশী—

দু'জন তারা—

আরো একজনকে অবিশ্যি কামনা করে মীনাক্ষী।

একটি শিশু।

টুলটুলে ফুলের মত শিশু।...চাঁদের মত মুখখানি। মাখনে গড়া গোল গোল নরম তুলতুলে হাত-পা।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াবে।

হোস্টেলে নিজের ঘরে বসে আপন মনেই স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছিল মীনাক্ষী—হোস্টেলের ভৃত্য নন্দন এসে বললে, দিদিমণি আপনার ফোন—ট্রাঙ্ক-কল—

ট্রাঙ্ক-কল! কোথা থেকে? মীনাক্ষী রীতিমত বিস্মিত হয় যেন।

তা ত জানি না, তবে বড়দি বললেন—

চল—আসছি—

মীনাক্ষী দোতলায় গিয়ে ফোন ধরল। কে আবার তাকে ট্র্যাঙ্ক-কল করতে পারে!

হ্যালো—

কে—মিস মীনাক্ষী রায়?

গলাটা যেন চেনা চেনা—অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারে না মীনাক্ষী।

বলে হ্যাঁ—

তারপরই শোনা গেল, ক্যামেলি—আমি—

কে?—চমকে ওঠে মীনাক্ষী—পার্থ—

হ্যাঁ—কি করছো?

কিন্তু তুমি, তুমি-এসময় কোথা থেকে?

কেন নৈনিতাল থেকে—

তোমার ওখানে কি ফোন আছে নাকি?

না—

তবে?

এখানকার এক হোটেলে বেড়াতে এসেছিলাম—তোমার কথা হঠাৎ মনে পড়তে লাগলো হোটেলের খোলা বারান্দায় বসে লেকের দিকে চেয়ে চেয়ে। মনে হলো এখন ত তুমি হোস্টেলেই আছো—তোমায় একটা ফোন করি না কেন—কী করছো ক্যামেলিয়া—

স্বপ্ন দেখছিলাম—

স্বপ্ন দেখছিলে!

হ্যাঁ গো—মিষ্টি করে বলে মীনাক্ষী।

কি স্বপ্ন দেখছিলে ক্যামেলি?

বলব না তো।

বলবে না?

না—

কেন?

স্বপ্নের কথা বুঝি বলে কেউ এমনি করে ফোনে?

তবে—কেমন করে বলে?

পাশাপাশি বসে কাঁধে কাঁধ রেখে, দুটি চোখ বুজে কানে কানে—

সত্যি—

সত্যি—সত্যি—

কিন্তু তুমি আসছো না কেন? কতদিন তোমাকে দেখি না বলত?

কতদিন দেখ না?

অনেক—অনেক দিন—যেন একটা যুগ—কবে আসছো বলো—

শিগ্‌গিরী যাবো—

পরের দিন অফিসে মীনাক্ষী মিঃ দোশানীকে বলে, সে কিছুদিনের ছুটি চায়—

দোশানী বলে, নিশ্চয়ই—কবে থেকে ছুটি চাও বল?

কাল থেকে—

নৈনিতাল যাবে বুঝি?

হ্যাঁ—

কিন্তু টিকিটের ব্যবস্থা করেছো? রিজার্ভেশন কি পাবে?

না পাই থার্ড ক্লাশে যাবো।

তা কি হয়—ঠিক আছে—You don't worry—get yourself ready—তোমার টিকিট ও রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা অফিসই করবে।

পরের দিন হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে সত্যি সত্যিই দেখলো মীনাক্ষী একটা ফার্ষ্ট-ক্লাশ বার্থ তার নামে রিজার্ভ করা রয়েছে।

ঘনশ্যাম তার আগেই এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিল—ওকে দেখে এক গাল হেসে একটা মুখবন্ধ খাম ওর হাতে তুলে দেয়—আ—আপনার টি—টিকেট—

খামটা হাতে নিয়ে মীনাক্ষী গাড়িতে উঠে বসে, খুব কম সময়ই ছিল—একটু বাদে গাড়ি ছাড়ল।

চারটি বার্থের নীচের দুটি বার্থে দু'জন সে ও একজন মহিলা—উপরের দুটি বার্থে দুটি কলেজের ছাত্রী।

তারা লক্ষ্ণৌ যাবে।

খামটার ভিতর থেকে টিকিট বের করতে গিয়ে মীনাক্ষী দেখে—শুধু টিকিটই নয়—সেই সঙ্গে শ পাঁচেক টাকাও আছে।

আর আছে মিঃ দোশানীর একটা চিঠি ঃ ছোট্ট চিঠি।

॥ ১৬ ॥

দোশানী লিখেছে :

মিঃ ফারগুসনের নির্দেশানুযায়ী তোমাকে সামনের মাসের মাইনার কিছু এ্যাডভান্স এই সঙ্গে দেওয়া হলো। তোমার যদি টাকার দরকার হয়, ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছো—টাকার প্রয়োজন হতে পারে। তোমার ছুটি আনন্দময় হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি—

—দোশানী।

আজকাল অফিসের ব্যাপারটা যেন অনেকটা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে মীনাক্ষীর। আজকাল মনের মধ্যে আর খুঁত খুঁত করে না।

নানা কথাও মনে হয় না।

মন যেন অনেকটা মেনে নিয়েছে।

অনেকটা পথ—সুটকেশের মধ্যে খামটা রেখে দিয়ে জানালার ধারে এসে বসল মীনাক্ষী।

অনেকটা পথ।

লক্ষ্ণৌ—তারপর কাঠগুদাম—সেখান থেকে বাসে নৈনিতাল।

কাঠগুদাম থেকে নৈনিতাল যেতে বাসে সমস্ত পথটা যেন একটা বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে মীনাক্ষী।

একটা ছোটোখাটো পাহাড়ের উপরে নৈনিতালে ডাঃ সর্বাধিকারীর মক্কেলের বাড়িটা।

আশ্বিনের রৌদ্র ঝলমল আকাশ।

চারিদিকে পাহাড় ও তার গায়ে গায়ে সবুজের সমারোহ—বাড়ির জানালা থেকে লেকটা দেখা যায়।

সামনের বারান্দায় একটা আরাম চেয়ারের উপর মিষ্টি রোদে গা এলিয়ে বসেছিল পার্থ।

নৈনিতালে এসে দিন পঁচিশের মধ্যেই তার চেহারা ও স্বাস্থ্যের যেন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে।

পার্থ দূর থেকে মীনাক্ষীকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ায়।

চড়াই পথটা বেয়ে উঠে আসছে মীনাক্ষী।

ক্যামেলিয়া—চিৎকার করে ডাকে পার্থ।

পার্থ—

সামনে এসে মীনাক্ষী দাঁড়াতেই দু'বাহু বাড়িয়ে পার্থ মীনাক্ষীকে বুকে টেনে নেয়—ক্যামেলি—আমার ক্যামেলিয়া—

পার্থর বুকে মাথাটা ঘষতে ঘষতে বলে মীনাক্ষী, কী করছো—এবারে ছেড়ে দাও, দেখছো না পিছনে কুলীটা কেমন হাঁ করে চেয়ে আছে—

উঃ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে—

বার বার কেবল ঐ কথাটাই বলতে থাকে পার্থ।

আর আমার হচ্ছে না বুঝি— কিন্তু কুলীটা যে রয়েছে—

থাকুক—

সত্যি please লক্ষ্মীটি—

পার্থ ছেড়ে দেয় অতঃপর মীনাক্ষীকে।

মীনাক্ষী কুলীকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করে।

তারপর ওর পাশে এসে বসে।

দুজনা দুজনার মুখের দিকে তাকায়।

তৃপ্তির-আনন্দের হাসি দুজনার মুখে।

কি মনে হচ্ছে জান ক্যামেলিয়া ?

কি ?

এই মুহূর্তটির যেন শেষ না হয়—let it be eternal—

তারপর কটা দিন সে এক নিবিড় ঘন আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যায়।

ঘুমের মধ্যে যেন একটা মধুর স্বপ্ন।

কখনো পাহাড়ে পাহাড়ে, কখনো লেকের জলে নৌকোয়—দিনে দুপুরে—রাত্রে—যেন এক অখণ্ড আনন্দের সুর ওদের দু'জনকে ঘিরে গুন গুন করতে থাকে।

দশটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল কেউ জানতেও পারে না। এবং দশদিন পরে হঠাৎ মীনাক্ষীর কাছে এক জরুরী তার।

অফিসের তারবার্তা : অবিলম্বে চলে এসো—

পার্থ শুধায়, কি হলো, কিসের তার ?

অফিসের—

কি লিখেছে ?

আজই রওনা হতে হবে—

আজই !

হ্যাঁ—

না—তুমি যেতে পারবে না ক্যামেলি—

সে কি !

হ্যাঁ—যাওয়া তোমার হবে না।

যাওয়া হবে না কি গো !

কি আবার চাকরি ছেড়ে দাও—রেজিগনেশন পাঠিয়ে দাও।

চাকরি ছেড়ে দেবো !

হ্যাঁ—

পাগল নাকি—

ওসব বুঝি না ক্যামেলি, চাকরি ছেড়ে দাও—যে চাকরি এমনি করে আমার কাছ থেকে আমার ক্যামেলিয়াকে কেড়ে নেয় সে চাকরি তোমাকে আমি করতে দেবো না।

তারপর ?

তারপর আবার কি ?

চলবে কেমন করে ? তোমার এখানকার খরচ—আমার ওখানকার খরচ তাছাড়া এখনো এখানে তোমাকে মাস তিনেক অন্ততঃ থাকতে হবে—

তার কি প্রয়োজন আর। আমি তো সুস্থ হয়ে উঠেছি—

তা হয় না পার্থ! ডাক্তাররা যা বলেছেন সেই ভাবেই আমাদের চলতে হবে।

মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে পার্থর।

পার্থর পাশে এসে বসে মীনাক্ষী। ওর পশমের মত মসৃণ চুলে গভীর স্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, অবুঝের মত কথা বলো না—তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ঠিকই কিন্তু এখনো তোমার এই স্বাস্থ্যকর জায়গায় আরো অন্ততঃ দু-তিন মাসের বিশ্রামের দরকার—

কিন্তু তুমি বুঝছো না ক্যামেলিয়া—

বুঝেছি—আর বুঝতে পারছি বলেই ত বলছি।

মুখে না বললেও আজ আর চাকরি ছাড়ার কথা ভাবতেই বুঝি পারে না মীনাক্ষী।

বিশেষ করে এখানে আসবার পর—রোগহীন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল উৎফুল্ল পার্থর মুখখানা দেখবার পর আজ আর তার পক্ষে চাকরি ছাড়বার কথা-আসতেই পারে না।

ভাবতেই পারে না কথাটা মীনাক্ষী।

জীবনের যে আনন্দ—জীবনেরও যে একটা অর্থ আছে—জীবনের শাখায় শাখায় যে মুকুল ফুটে উঠতে পারে এমনি করে এর আগে সে কোন দিনই ভাবতে পেরেছিল কি।

দারিদ্র্য, অভাব—টানাটানির সংসারের সঙ্গেই তার এ যাবৎকাল পরিচয়। এমনি করে জীবনের পাত্রকে সে ত উপচে পড়তে কোন দিনই দেখেনি।

সেই সুযোগ যখন এসেছে—বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদের মত কেন সে তাকে হেলায় হারাবে। না—সে ভোগ করবে।

প্রাণ ঐশ্বর্যের পেয়ালাকে চুমুক দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করবে।

এই ত জীবন।

এই স্বাচ্ছন্দ্য—এই আরাম—এই নিশ্চয়তা—এই আনন্দ—এই ত সত্যকার জীবন। কেন সে এ জীবন ত্যাগ করবে।

না।

কি ভাবছো ক্যামেলি—

কিছু না—বলছিলাম আর ২।৩ মাস সময় ত—দেখতে দেখতে কেটে যাবে, তারপর থেকে শুধু আমরা—আমাদের আর কেউ আলাদা করতে পারবে না—

পার্থ কোন জবাব দেয় না—দূর রৌদ্রোজ্জ্বল লেকের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকে।

পার্থ!

উঁ!

কি ভাবছো?

কিছু না—

না তুমি ভাবছো—বল কি ভাবছো?

কেন জানি না ক্যামেলি—আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে—

কেমন যেন একটু শংকিত দৃষ্টিতেই প্রশ্নটা করে মীনাক্ষী পার্থর মুখের দিকে তাকায়।

ওর মনের কথাটা বুঝি মীনাক্ষী বুঝবার চেষ্টা করে।

কি বলতে চায় ও।

কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করে না। বরং স্মিতভাবেই বলে, ভয় করছে কেন গো—

হ্যাঁ—

পাগল। কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে—

ঐ কথাটা বলে মীনাক্ষী আশ্বাস কি নিজেকেও নিজে দেয়!

সেই দিনই বিকেলে কলকাতার দিকে আবার রওনা হয় মীনাক্ষী।

কলকাতা পৌঁছবার আগে বর্ধমানেই একটা তার পেল সে: হাওড়া ষ্টেশনে মনসুর গাড়ি নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে। সে যেন ষ্টেশন থেকে সোজা গ্র্যাণ্ডে চলে আসে, মিঃ ফার্গুসন তার জন্য হোটেলে তার রুমে অপেক্ষা করবে।

মীনাক্ষী ঠিক যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

এত তাড়াহুড়া কিসের বুঝতে পারে না।

যা হোক হাওড়াতে নেমে তারের নির্দেশ মত সে ফার্গুসনের সেই অপেক্ষমান শাদা গাড়িতেই উঠে বসে।

সেই ১১৯ নং ঘর।

পরিচিত ঘর।

দরজায় নক্ করতেই ভিতর থেকে আহ্বান এলো, yes—come in. ভিতরে এসো—

মীনাক্ষী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পড়ল ঘরের মধ্যে একাকী মিঃ ফার্গুসন একটা সোফাব মধ্যে বসে আছে।

এসো মিস রায়—বোস—you had a long journey—দীর্ঘ পথশ্রমে নিশ্চয় তুমি ক্লান্ত কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী তাই সোজা ষ্টেশন থেকে তোমাকে এখানে চলে আসবার জন্য জরুরী তার করেছিলাম—কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, বোস—

মীনাক্ষী সামনের সোফাটায় আস্তে আস্তে বসল।

কিন্তু তোমারত আরো আগে এসে পৌঁছাবার কথা—এত দেরি হলো! তোমার ট্রেনটা কি লেট ছিল?

হ্যাঁ—প্রায় আড়াই ঘণ্টা লেট।

যাক শোন, যে জন্য তোমাকে জরুরী তার করে কলকাতায় এত তাড়াতাড়ি ডেকে আনিয়েছি, তোমার নতুন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট অনুযায়ী এবারে কাজ শুরু করতে হবে—সব তোমাকে কি করতে হবে না হবে detailsরে বলবো কিন্তু তার আগে পরিশ্রান্ত তুমি তোমার বিশ্রামের দরকার—তুমি বরং কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে নাও।

তবে আমি এখন হস্টেলে—

না, তার দরকার নেই এই হোটেলেই ১২০ নং ঘরটা তোমার জন্য বুক করা হয়েছে।

এই হোটেলে ১২০ নং ঘর ?

হ্যাঁ—

কিন্তু—

শোন, এখন বেলা প্রায় দেড়টা বাজে—সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত তুমি রেষ্ট নিতে পারবে।

রেষ্ট আমি পরে নেবো—আগে আপনি আমাকে কাজের কথাটা বলুন—

এখুনি শুনতে চাও ?

হ্যাঁ—বলুন।

বেশ তবে শোন—আমাদের কাজের কথায় আসার আগে তোমাকে একটা ফটো দেখাতে চাই—

ফটো !

হ্যাঁ—এই যে দেখ—

বলতে বলতে মিঃ ফার্গুসন একটা খাম থেকে একটা ফটো বের করে সামনের টেবিলের ওপরে রাখল ওর সামনে।

মীনাক্ষী চেয়ে দেখলো ফটোটা একটি মধ্য বয়সী পুরুষের। বেশ মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা—গোলাল ভারী মুখ। দাঁড়ি গোফ নিখুঁত ভাবে কামান।

পরিধানে স্যুট।

চেনো ওকে ? দেখেছো কখনো ?

না—

চিনে রাখ ভাল করে—ওই ফটোটা হচ্ছে মিঃ লোহিয়ার—যাক শোন—

মীনাক্ষী চেয়ে থাকে ফার্গুসনের মুখের দিকে।

মিঃ আর, লোম্যান—ইন্‌ডিয়ান ক্রিশ্চান—অত্যন্ত influential M. P—

কেমন যেন বোবা—বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মীনাক্ষী ফার্গুসনের মুখের দিকে। বলছেন M. P. লোম্যানের কথা—

অথচ লোহিয়ার ফটো তাকে দেখান হচ্ছে কেন কিছুই মাথামুণ্ডু যেন বুঝে উঠতে পারছে না মীনাক্ষী।

ফার্গুসন বলতে থাকে, ওরই পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে পার্টি, মানে আজ একটা ডিনার আছে। অনেক ফরেন ডিপ্লোম্যাটস আসবে ঐ ডিনারে—আর আসবেন defence minister-এর ডেঃ সেক্রেটারী মিঃ লোহিয়া। ঐ ফটো যাঁর—I hope you understand me—

না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ ফার্গুসন তোমার কথা—

মিঃ ফার্গুসন প্রত্যুত্তরে মৃদু হাসলো, তারপর বললে, বুঝতে পারছো না—না—শোন ঐ ডিনারে ড্রিংকের ব্যবস্থা ত আছেই আর আছে—কিছু নাচগানের—আমি জানি you sing very well—তুমি চমৎকার গান গাইতে পারো—

আমি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুমি—তোমাকে গান গাইতে হবে ঐ ডিনার পার্টিতে অবিশ্যি শুধু sweet voiceয়ের উপর তোমার আমি depend করছি না—I know Mr. Lohia—তাকেত চিনি সৌন্দর্যের সে একজন real admirer—and you have a charming beauty—

এসব তুমি কি বলছো মিঃ ফার্গুসন—অত্যন্ত আপত্তিকর কথা—বলতে বলতে উত্তেজনায় প্রায় উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী, মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে মীনাক্ষীর তখন।

ফার্গুসন বাধা দিয়ে বলে, বোস—বোস—don't get excited—অত উত্তেজিত হবার কিছু নেই—

মিঃ ফার্গুসনের গলাটা যেন হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা ও কঠিন মনে হয় মীনাক্ষীর।

চমকে ওঠে মীনাক্ষী যেন সে গলার স্বরে—হঠাৎ একটু থিতিয়েও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই যায়—কিন্তু পরক্ষণেই বলে, আমি পারব না—

না।

কি পারবে না?

যা তুমি বলছো—

কিন্তু তুমিত এখনো আমার কথা যা বলতে চাই সব শোনোই নি—

কিন্তু—

শোন, ব্যাপারটা তুমি যা ভাবছো ঠিক তা নয়—আমি মানে আমাদের ফার্ম কতকগুলি আমাদের ব্যবসার পক্ষে প্রয়োজনীয় খবর ঐ লোহিয়ার কাছ থেকে জানতে চায়।

খবর!

হ্যাঁ—কিছু প্রয়োজনীয় খবর—

কথাটা পরিষ্কার করে বল!

পরিষ্কার করেই বলচি শোন, বলছিলাম আমাদের বিজনেসের সুবিধার জন্য—ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা—বিশেষ করে সীমান্ত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যতটা সম্ভব news—মানে সংবাদ তোমাকে ঐ মিঃ লোহিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনতে হবে। কারণ বুঝতেই পারছো সীমান্ত প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যদি ভারতবর্ষ strong না হয় তাহলেই নানা গোলমাল দেখা দেবে ও ব্যবসারও মন্দা পড়বে—

কিন্তু?

হ্যাঁ শোন, আমি জানি ব্যাপারটা তুমি ম্যানেজ করতে পারবে, I mean তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে ব্যাপারটা কষ্টসাধ্য হবে না—

কিন্তু এসব তুমি কি বলছো মিঃ ফার্গুসন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না—আমি কেন ঐ সব কাজ করতে যাবো—আমি তোমাদের করেসপনডেন্স ক্লার্ক মাত্র—

তাই তুমি জান বটে কিন্তু আসলে কি তাই—

তবে কি?

অফিসের সব সিক্রেটইত তোমার হাত দিয়ে পাস্ করে—তাছাড়া—

তাছাড়া কি ?

ভেবে দেখ তোমাকে যে মাইনা দেওয়া হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কোন দেশে কোন অফিসেই একজন করেসপনডেন্স্ ক্লার্ককে দেওয়া হয় না—

কিন্তু—

তোমাকে অতগুলো করে টাকা আমরা মাস মাস দিচ্ছি—সে নিশ্চয়ই কতকগুলো চিঠি draft ও type করবার জন্য যে নয় সেটা আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো অনেক আগেই। আর যদি না পেরে থাকো তাহলে বলবো তোমার মত একজন বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে কথাটা বোঝা উচিত ছিল অন্তত—

মীনাক্ষী যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গিয়েছে, কি বলবে বুঝতে পারে না। অতঃপর ?

সব কিছু যেন হঠাৎ কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে।

শোন—Don't be sentimental—and don't be a fool ! কোন অভাব তোমার থাকবে না—পার্থকে বিয়ে করে যাতে তোমাদের happy ও easy going life হয় সে ব্যবস্থাও আমরা করবো—অবিশ্যি আমার কথা মত যদি তুমি চল। অবিশ্যি এও অস্বীকার করবো না শুধু efficiency-রই-প্রয়োজন নয় তোমার কাজে riskও আছে—কিন্তু সে জন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই—আমরা আছি—

মাথার মধ্যে তখন ঘুরছে মীনাক্ষীর।

সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে। গলাটা শুকিয়ে উঠছে।

এসব কি সে শুনছে।

না—না—এ অসম্ভব—এ সে পারবে না—উঠে দাঁড়ায় মীনাক্ষী, ক্ষমা কর তুমি আমাকে মিঃ ফার্গুসন—এ কাজ আমার দ্বারা হবে না—

হবে না!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকায় ফার্গুসন মীনাক্ষীর চোখের দিকে।

না। আমি resignation দিচ্ছি—

Don't be a fool মিস্ রায়—

বললাম তো আমি পারবো না—আমাকে ক্ষমা করো—

কিন্তু তোমাকে যে পারতেই হবে—

না, না—

মিস্ রায়—চাপা অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে ফার্গুসন।

পারবো না—আমি পারবো না। Accept my resignation—

পারতে তোমাকে হবেই—

মিঃ ফার্গুসন—

Yes! পারতে তোমাকে হবেই। আর না পারলে we will hand over you to the police—বল—now tell me—what do you prefer—কি তুমি চাও—আমি যা বলছি তাই করবে, না পুলিশে যেতে চাও—

পুলিশ।

হ্যাঁ—পুলিশ—

কিন্তু আমি—আমি কি করেছি?

কি করেছো? সহসা যেন ফার্গুসনের মুখের 'পর থেকে মুখোশটা খুলে যায়।

একটা নিষ্ঠুর হিংস্র কঠিন মুখ প্রকাশ পায়।

দু' চোখের দৃষ্টিতে মমতাহীন নিষ্ঠুর একটা জিঘাংসা যেন।

বাঘের থাবার মধ্যে যেন আটকা পড়েছে মীনাক্ষী—পায়ের নীচে মাটিটা যেন সরে যাচ্ছে—একটা নিরালম্ব শূন্যতা—ফার্গুসন বলে চলেছে তখন :

মনে আছে ৭ই জুলাই ৭০৭ বোয়িং-এ তুমি বম্বে গিয়েছিলে—

আমি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি—not লায়লা বানু—লায়লা বানু বলে কেউ কোনদিন ছিল না, আজও নেই—ওটা তোমারই ফটো—পাশপোর্টে—লায়লা বানু পরিচয়টা তোমার একটা মিথ্যে—

কিন্তু তোমরাই ত—

বম্বে এয়ার পোর্টে যার সঙ্গে তুমি দেখা করেছিলে সে পিকিং গভর্নমেণ্টের লোক—মিঃ সান—তার হাতে যখন তুমি চিঠিটা তুলে দাও সে ফটো আমাদের আছে। আশা করি দুটো চার্জই যথেষ্ট হবে। ১নং মিথ্যা পরিচয়ে এয়ার ট্রাভল করা—২নং মিঃ সানের সঙ্গে যোগাযোগ বোম্বাই এয়ারপোর্টে একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে—যাবজ্জীবন না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে কারাদণ্ড আশা করি এতেই হবে তোমার—

না, না—হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়ে মীনাক্ষী, এ তুমি করতে পার না—You can't—you can't do it—আমি এসব কিছু জানি না—সব—সব তোমাদের হীন জঘন্য ষড়যন্ত্র—আমাকে তোমরা হাতের পুতুল করে—

থামো—dont be so loud my dear—এতে করে কোন ফল হবে না। তুমি কচি খুকী নও—রীতিমত লেখাপড়া জানা একটি যুবতী। কেউ তোমার ও-কথা বিশ্বাস করবে না।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মীনাক্ষী।

কান্নায় ভেঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে সোফাটার উপর একেবারে বসে

পড়ে, না—না—এ ভাবে তোমরা আমাকে মের না—আমাকে ছেড়ে দাও—মুক্তি দাও—

কেঁদে কোন ফল হবে না মিস্ রায়। হয় তুমি আমাদের প্রস্তাব মেনে নেবে নচেৎ—এই মুহূর্তে আমি পুলিশে ফোন করব —

দু' চোখে প্রবহমান অশ্রুধারা—সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল মীনাক্ষী,—বেশ—তবে তাই হোক—পুলিশেই আমাকে ধরিয়ে দাও—আমার পাপের—অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব—যাও—যাও—ফোন কর পুলিশকে—

Then you have decided—তাই স্থির—

হ্যাঁ—তাই—তাই হোক—

অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় ফার্গুসন বলতে থাকে :

অবিশ্যি তুমি তাই চাইলে তাই হবে বৈকি! কাল সকালেই সংবাদপত্রে তোমার photo দিয়ে যখন head line-য়ে news ছাপা হবে—সারা দেশ—তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে—এবং পার্থপ্রতীমও জানবে—মীনাক্ষী রায়ের সত্যকারের পরিচয়টা কি—একটা ঘৃণ্য গুপ্তচর—spy—

অকস্মাৎ একটা অস্ফুট আর্ত চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী।

অলক্ষ্যেই—তার গলা থেকে যেন চিৎকারটা বের হয়ে আসে।

হ্যাঁ, জানবে—একটা spy—spy ছাড়া আর কি, যা করছো তুমি সেত একজন spyয়েরই কাজ এবং যার ফলে তোমার এতদিনকার স্বপ্ন—তোমার ভালবাসা—তোমার পার্থপ্রতীম—ঘৃণায় লজ্জায় হয়ত শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করবে—

না, না—না—চুপ কর—চুপ কর—

বানবিদ্ধ একটা পশুর মতই যেন আর্তনাদ করে ওঠে মীনাক্ষী।

কিন্তু ফার্গুসনের যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই—তেমনি নিরাসক্ত ঠাণ্ডা গলায় মীনাক্ষীর ভীত ত্রস্ত চোখের উপর চোখ রেখে বলতে থাকে :

সে যখন জানবে একটা ঘৃণ্য spy-এর অর্থে সে আজ সুস্থ হয়ে উঠেছে—সমস্ত দেশের ধিক্কারের—লজ্জার হাত থেকে তখন নিজেকে বাঁচাতে আত্মহত্যা ছাড়া আর কি পথ থাকবে সে বেচারার। যে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন—তার ভালবাসা—তার প্রেম—একটা ঘৃণ্য—গুপ্তচরকে ঘিরে—

Will you stop—stop—stop—

চিৎকার করে উঠে মীনাক্ষী। আর্তনাদ করে ওঠে।

না, না—সে তা পারবে না। এমনি করে সমস্ত দেশের কাছে—সমস্ত মানুষের কাছে—বিশেষ করে পার্থর কাছে সে ছোট হয়ে যেতে পারবে না।

ঘৃণায় সবাই তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেবে।

বোস—বোস—তুমি কাঁপছো মিস্ রায়—হাত ধরে বসিয়ে দিল ফার্গুসন মীনাক্ষীকে সোফাটার 'পরে।

মীনাক্ষী সোফাটার 'পরে বসে দুহাতে মুখ ঢাকে। কাঁপছে তার সর্বশরীর তখন—থর থর করে কাঁপছে।

একটা মর্মন্তুদ হাহাকার যেন সমস্ত বুকখানাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এ সে কি করল। মীনাক্ষী একি করল—সত্যিই তাহলে সে একটা spy—ঘৃণ্য গুপ্তচর—ঘৃণ্য দেশদ্রোহী--

হায় ভগবান একি হলো।

ঘরের ভিতরে গিয়ে ফার্গুসন ইতিমধ্যে সোফা থেকে উঠে একটা গ্লাসে করে খানিকটা ব্রাণ্ডি নিয়ে এল।

Take this—

হাত থেকে ফার্গুসনের গ্লাসটা নিয়ে চোঁ চোঁ করে এক টানে সমস্ত ব্র্যাণ্ডিটুকু পান করে ফেলে মীনাক্ষী।

একটা তরল অগ্নিপ্রবাহ যেন গলা থেকে জ্বালা করতে করতে বুক দিয়ে নেমে যায়।

মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে ওঠে।

সমস্ত কিছু যেন ছায়াছবির মতই চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে মীনাক্ষীর।

তিল তিল করে প্রায় এই চার মাসে যা সে গড়ে তুলেছিল—তার স্বপ্নের প্রাসাদ—প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পে যেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যাচ্ছে।

তার মুখের একটি ছোট্ট 'না' মানেই সব কিছুরই সমাপ্তি।

তার এতদিনকার ভালবাসা—তার পার্থ—তার প্রেম—এইখানে এই মুহূর্তেই শেষ।

সারা দেশই যে তাকে ঘৃণা করবে—চরম ধিক্কার দেবে তাই নয়—পার্থ—তার পার্থ কি আর এত আঘাতের পর বাঁচবে!

সত্যিই এই চরম অপমান আর লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য হয়ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে সে।

মৃত্যুর কারণ হবে সে পার্থর।

না, না—পার্থ—তুমি আমায় ঘৃণা করবে—আমার কারণে তুমি প্রাণ দেবে—সে আমি হতে দেবো না।

পারব না।

তুমি বেঁচে থাক—সুস্থ থাক—আমার লজ্জা নিয়ে আমিই তোমার কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে সরে যাবো।

আমার লজ্জা—আমার ঘৃণা—আমার অপমান—আমার দুঃখ আমারই থাক।

দু'চোখ ভরে আবার জল আসে মীনাক্ষীর।

নিঃশব্দে সেই প্রবহমান অশ্রুধারা তার গণ্ড ও চিবুককে প্লাবিত করতে থাকে।

মিঃ ফার্গুসন কোন কথা বলে না— ওকে কাঁদতে দেয়, কাঁদুক—

বেশ কিছুক্ষণ পরে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মিস রায়—

মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকাল।

দু'চোখে ভাষাহীন দৃষ্টি—কোণায় কোণায় অশ্রু টলমল করছে।

Then what you have decided ? কি ঠিক করলে ?

আমি প্রস্তুত মিঃ ফার্গুসন—

That's like a good girl ! তুমি তাহলে তোমার ঘরে যাও। স্নান কর, বিশ্রাম কর—We will meet again at five—সন্ধ্যা পাঁচটায়—

মীনাক্ষী উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ১৮ ॥

কিন্তু ১২০ নং ঘরে এসে স্নানও করল না খেলোও না কিছু। একটা সোফার 'পরে ঝিম দিয়ে বসে রইল।

সমস্ত যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

একটা নিরালম্ব শূন্যতা—একটা দীর্ণ হাহাকার যেন ওর সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে।…ওর সমস্ত অস্তিত্ব সমস্ত চেতনাকে যেন একটা সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত করে দিয়েছে।

ঠিক সন্ধ্যা পাঁচটায় ঘরের দরজায় নক পড়ল।

হোটেলের একজন বয় এসে বললে, ১১৯ নং ঘরের সাহেব তাকে সেলাম জানিয়েছে।

হঠাৎ যেন চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

পাঁচটা। পাঁচটায় মিঃ ফার্গুসনের সঙ্গে দেখা করবার কথা।

তুমি যাও—বলগে আসছি—

একটা নির্জীব পুতুলের মত কোন মতে হেঁটে মীনাক্ষী ১১৯ নং ঘরে এসে প্রবেশ করে। বসে ছিল একটা সোফায় ফার্গুসন, পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফার্গুসন যেন চমকে ওঠে।

What's the matter my girl! কি হয়েছে—মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে—একি তুমি পোশাক বদল করনি—স্নানও কর নি দেখছি—

আমাকে কি করতে হবে মিঃ ফার্গুসন? নিরাসক্ত ঠাণ্ডা নিস্তেজ গলায় প্রশ্নটা করে মীনাক্ষী।

সে সব হবে—আগে যাও তুমি তোমার ঘরে—স্নান করে জামাকাপড় বদলে fresh হয়ে এসো—যাও—

আমি ঠিক আছি—বল তুমি কি করতে হবে আমায়?

না কোন কথা নয় যাও। ওঠো—

মীনাক্ষী আবার উঠে দাঁড়াল।

ফিরে এলো আবার নিজের ঘরে।

গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে—শরীরটার মধ্যে যেন একটা আগুনের তাপ।

স্নান করার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না তবু স্নান করল মীনাক্ষী।

কাপড় বদলাল—তারপর আবার এসে ঢুকল ১১৯ নং ঘরে।

এই যে এসো, now you look a bit fresh—বোস।

মীনাক্ষী বসল।

Why you are getting so nervous শান্ত হও—কাজটা এমন কিছুই একটা কঠিন নয়—

থাক মিঃ ফার্গুসন, তোমার যা বলবার বল।

মিঃ লোম্যানের গেস্ট হয়ে তুমি আজকের ডিনারে যাবে। তোমার নাম হবে—লায়লা বানু—

লায়লা বানু!

হ্যাঁ—গান গাইবে তুমি—মিঃ লোহিয়াই সাগ্রহে আমি জানি তোমার সঙ্গে আলাপ করবে—He is fiftyfive—তবু আমি জানি মেয়েদের ব্যাপারে He is a greedy wolf—excuse me my tongue মিস রায়—Well—তোমাকে আর কি বলব—আমার তোমার 'পরে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে—I want some important news—

ঐ সময় বেয়ারা এসে বলল, মেহেবুব এসেছে—

ঘরে পাঠিয়ে দাও। ফার্গুসন বলে।

একটু পরে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকে সেলাম দিল।

এই যে মেহেবুব তুমি এসেছো—শোন—আমার এই পাশের

ঘরে তোমার প্রয়োজনীয় সব মেক-আপ সামগ্রী ও ড্রেস প্রস্তুত আছে—লায়লাকে তুমি মেক-আপ দিয়ে সাজিয়ে দাও। যাও লায়লা—ওর সঙ্গে যাও।

চেতনাহীন অসাড় দেহটা নিয়ে কোন মতে যেন মেহেবুবের সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে মীনাক্ষী প্রবেশ করল।

বসুন এই চেয়ারটায়—মেহেবুব বলে।

সিনেমা ও থিয়েটার জগতের বিখ্যাত মেক-আপম্যান মেহেবুব খান।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে মেক-আপ দিয়ে সাজগোজ করিয়ে মীনাক্ষীকে যখন ঘরের আর্সীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল মেহেবুব—তখন আর্সীর মসৃণ গাত্রে প্রতিফলিত নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে মীনাক্ষী নিজেই যেন বোবা হয়ে যায়।

কে ঐ আর্সীর গাত্রে প্রতিফলিত, ইন্দ্রাণী নারী!

কিবা বংকিম ভ্রু—কিবা কাজল টানা দুটি আঁখি—বাঁধুলী পুষ্পের মত রক্তাভ দুটি ওষ্ঠ।

মিঃ ফার্গুসন দেখে বলে, চমৎকার! ঠিক আছে মেহেবুব তুমি যেতে পার—

মেহেবুব সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

ফার্গুসন নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, Now it is quarter past seven—ঠিক আটটায় গাড়ি আসবে—মনে আছে ত কি করতে হবে তোমার।

মীনাক্ষী নীরব।

বসে থাকে যেন পাষাণ প্রতিমা।

Now মিস রায়—হঠাৎ গলাটা একটু নীচু করে বলে ফার্গুসন, জীবনে অর্থ—প্রতিষ্ঠা—সুখ—বৈভব—সব তোমাকে আমি দেবো। বেশী দিন নয় মাস চারেক তোমাকে আমার প্রয়োজন। এই চার

মাসে আমার কাজগুলো তুমি করে দাও তারপর তোমার ছুটি — মুক্তি তোমার।

মীনাক্ষী এতক্ষণে চোখ তুলে তাকাল ফার্গুসনের দিকে।

Yes—তারপরই তোমার মুক্তি ইচ্ছে করলে তুমি আবার মিঃ কুলকারনীর ওখানে চাকরি পেতে পারো কিন্তু তার আর কোন প্রয়োজন হবে না, যে অর্থ তোমাকে দেবো বাকী জীবনটা হেসে খেলে কেটে যাবে।

মীনাক্ষী তথাপি নীরব।

মিঃ লোম্যানের বাড়ির ডিনার পার্টিতে গান গেয়ে এবং তার রূপের আগুনে সে রাত্রে লায়লা বানু যেন আগুন জ্বেলে দেয়।

মিথ্যা বলেনি মিঃ ফার্গুসন—নারী সম্পর্কে সত্যিই একটা দুর্বলতা আছে লোহিয়ার।

লায়লার আশেপাশে যেন আঠাঁর মত এঁটে থাকে লোহিয়া।

ডিনারের চাইতেও মদের ব্যাপারটাই সেদিন লোমানের ডিনার পার্টিতে বেশী ছিল। পেগের পর পেগ সব উড়াতে থাকে।

হঠাৎ মীনাক্ষীর নজরে পড়ে মিঃ ফার্গুসনও পার্টিতে আছে এবং সর্বক্ষণ তার শ্যেন দৃষ্টি যেন তাকে লেহন করছে চারদিক থেকে।

নিজের অজ্ঞাতেই শিউরে ওঠে মীনাক্ষী।

লোহিয়া একসময় ঘরের এক কোণে মীনাক্ষীকে টেনে নিয়ে যায়। সামনেই খোলা বারান্দাটা চোখে পড়ে, দরজা পথে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে।

লায়লা, you didn't drink at all—এক ফোঁটা পান কর নি তুমি—

আমি ত ড্রিংক করি না—

আজকের দিনে কেউ ড্রিংক করে না তাই হয় নাকি! you must—একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি—উঠে গেল লোহিয়া এবং একটু পরে দুটো গ্লাসে দু' পেগ হুইস্কী নিয়ে এসে হাজির হল।

নাও—ধর—

কিন্তু মিঃ লোহিয়া—

Oh—don't be silly—ধর—hold it—

নজর পড়ল মীনাক্ষীর ঐ মুহূর্তে ঘরের অন্য কোণে দাঁড়িয়ে ফার্গুসন—তার সাপের চোখের মত ছু'চোখের স্থির দৃষ্টি তারই 'পরে নিবদ্ধ।

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল মীনাক্ষী।

To night is ours. ভাল কথা তোমার ঠিকানাটা জানা হয়নি লায়লা—কোথায় তুমি থাক?

গ্র্যাণ্ডে—

হোটেলে কেন?

শিগ্‌গিরী আমাকে দিল্লী যেতে হবে—

Really? how fine it would be—কি চমৎকারই না হবে। কবে আসছো দিল্লী—

শিগ্‌গিরী—

আমি আরো ছু'দিন আছি—কাল আবার নিশ্চয় দেখা হবে।

কেন হবে না! আমার room number হচ্ছে ১২০।

জপমালা হয়ে রইলো নম্বরটা—

সেই রাত্রেই মীনাক্ষী রায়ের মৃত্যু হলো।

মীনাক্ষীর শবদেহে জন্ম নিল লায়লা বানু।

সংগীতপটিয়সী লায়লা বানু।

একটু সংবাদ চেয়েছিল ফার্গুসন—অনেক বেশী সংবাদই সে লায়লার দৌলতে পেল।

ছু'দিন বাদে লোহিয়া চলে গেল এবং তার দিন পনের বাদেই এক রাত্রে ভাইকাউণ্টে চেপে দিল্লী যাত্রা করল মীনাক্ষী।

মীনাক্ষী নয় লায়লা বানু।

॥ ১৯ ॥

তারপর দুটো মাস যেন একটা ঘূর্ণিবাত্যা বয়ে গিয়েছে লায়লার জীবনের ওপর দিয়ে।

বিচিত্র সব কাজে তাকে আজ মাদ্রাজ—কাল কলকাতা—পরশু বোম্বাই—নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

বিচিত্র বেশ সব নিতে হয়েছে।

কখনো চীনে পোশাক—কখনো জাপানী—কখনো বর্মী—কখনো পাঞ্জাবী—কখনো ইউ, পি—বিচিত্র বেশে বিচিত্র রূপে তাকে দেখা গিয়েছে নানা জায়গায়।

আর দিল্লী ও কলকাতায় একটি নাম শোনা গিয়েছে উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরেদের মুখে-মুখে—লায়লা বানু।

লায়লা বানু অনন্যা—অসামান্যা—এক নারী।

সুধাকণ্ঠী লায়লার গান শুনলে যেন পাগল হয়ে যেতে হয়।

মীনাক্ষী রায় হারিয়ে গিয়েছে—মুছে গিয়েছে যেন পৃথিবীর বুক থেকে মীনাক্ষী রায় নামটা।

অবিশ্যি মীনাক্ষী রায় নামটার মধ্যে কিইবা ছিল।

মধ্যবিত্ত ঘরের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। যে মেয়েটি অক্লান্ত চেষ্টায় ধীরে ধরে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে।

অতি নগণ্য একটি মেয়ে—যে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল।

ভালবেসে বাঁচতে চেয়েছিল—ঘর—একটি ছোট ঘর বাঁধতে চেয়েছিল।

সে যদি হঠাৎ একদিন হারিয়ে যায়ই পৃথিবীর জনারণ্যের মধ্যে কার তাতে কতটুকু কি এসে যাবে?

চিঠি আসে পার্থর কাছ থেকে—

কি হয়েছে তোমার ক্যামেলি বল ত! কেন মনে হচ্ছে তুমি বদলে গিয়েছো। একেবারে বদলে গিয়েছো।

তোমার চিঠির মধ্যে সে সুরটা আর পাই না।

আমি ত এখন একেবারেই সুস্থ হয়ে গিয়েছি—একটা দিনও আর এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

তাছাড়া কতদিন তোমাকে দেখি না।

পার্থর চিঠিগুলো যখন আসে হাতে নিয়ে পাথরের মতই যেন বসে থাকে মীনাক্ষী।

পাথরের চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে শুধু।

ইচ্ছে হয় পার্থকে লেখে।

ক্যামেলিয়া তোমার মরে গেছে পার্থ।

সে অনেক দিন হলো মরে গিয়েছে।

তার খোঁজ আর করো না। ভুলে যাও তোমার ক্যামেলিয়াকে।

হঠাৎ ঐ সময় পার্থর একটা চিঠি এলো।

আমি কলকাতায় ফিরছি। হাওড়া ষ্টেশনে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে কিন্তু—

তোমার পার্থ।

চিঠিটা পড়ে মীনাক্ষীর মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ে।

সর্বনাশ—এখন কি উপায় হবে। কি করবে এখন মীনাক্ষী। পার্থ কলকাতায় এসে পড়লে আর ত তার কাছ থেকে সে নিজেকে দূরে আড়াল করে রাখতে পারবে না। এতদিনকার মিথ্যেটা এবার ধরা পড়বে।

মুখোশটা তার খুলে পড়বে।

মীনাক্ষীর আড়াল থেকে লায়লা বের হয়ে আসবে। কি করবে—কি করবে মীনাক্ষী।

মাঝখানে আর মাত্র তিনটে দিন।

সেই ফ্ল্যাটটা মীনাক্ষী ছেড়েছিল না। বিরজু দেশে—তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেয় ও টি, এম্, ও করে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেয় অবিলম্বে ফিরে আসবার জন্য, জানিয়ে দেয়—তার মনিব পার্থ ফিরে আসছে।

একদিনেই তারপর ফ্ল্যাটটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ফেলে।

পার্থ তার নিজের ফ্ল্যাটেই এসে উঠুক। তাছাড়া উঠবেই বা কোথায়—ঐ ফ্ল্যাটের সঙ্গে কত স্মৃতি তাদের জড়ানো।

কত কথা—কত হাসি—কত গান—তারপর কত ব্যথা—কত দুঃখ।

পার্থ ঐখানেই এসে উঠুক।

মীনাক্ষী এক প্রৌঢ় পাঞ্জাবীর ছদ্মবেশ নেয়।

পায়জামা পাঞ্জাবী—মাথায় পাগড়ি—মুখ ভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি—চোখে কালো কাচের চশমা। একটু নুয়ে যেন হাঁটে।

ট্রেন থেকে নেমে পার্থ সতৃষ্ণ নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে—কোথায়—কোথায় তার ক্যামেলিয়া—

প্রৌঢ় পাঞ্জাবী ধীর পায়ে এগিয়ে আসে—নমস্তে বাবুজী—

নমস্তে—একটু যেন চমকেই তাকায় পার্থ পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দিকে।

হঠাৎ যেন চমকে উঠেছিল—হঠাৎ যেন মনে হয়েছিল গলাটা চেনা-চেনা—

নমস্তে—

আপ নৈনিতাল সে আ রহে হে—

হ্যাঁ—

আপ কো নাম পারথ প্রতীম—

হ্যাঁ—কিন্তু আ—আপনি কে আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না—

নেহি বাবুজী—মুঝে আপ পয়ছানে গে নেহি—চিনতে পারবেন না আপনি আমাকে—আমার নাম গুলজারী সিং—আপনি নিশ্চয়ই মিস রায়কে খুঁজছেন—

হ্যাঁ—মানে—

কিন্তু তিনি ত কলকাতায় নেই—

কলকাতায় নেই!

না—

হঠাৎ অফিসের জরুরী কাজে হংকং যেতে হয়েছে—তারপর সিংগাপুর—মালয় হয়ে ফিরবেন—আপনার নামে একটা চিঠি দিয়ে গিয়েছেন আমার হাতে, এই নিন—

পকেট থেকে চিঠিটা প্রৌঢ় বের করে পার্থর হাতে তুলে দিল।

আচ্ছা বাবুজী—আমি আসি—নমস্তে—

প্রৌঢ় ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করে।

পার্থ চিঠিটা খুলে পড়ল :

পার্থ,

হঠাৎ অফিসের জরুরী কাজে হংকং যাচ্ছি—সেখান থেকে সিংগাপুর--মালয়—রেঙ্গুন ঘুরতে হবে। আমাদের সেই পুরাতন ফ্ল্যাটেই তোমার সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। বিরজুকেও সংবাদ দিয়েছি আসবার জন্য।

তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

তোমার ক্যামেলি।

পার্থ চিঠিটা পকেটে রেখে কুলীকে বললে, চলরে—একটা ট্যাক্সী ধরতে হবে।

চোখের জল চাপতে চাপতে ফিরে এলো মীনাক্ষী তার পার্ক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে।

লায়লা বানু এখন পার্ক ষ্ট্রীটে একটা ফ্ল্যাটে থাকে।

মনে মনে কেবল বলতে থাকে মীনাক্ষী—ক্ষমা করো পার্থ, ক্ষমা করো। আমার প্রতারণার জন্য আমার মিথ্যার জন্য ক্ষমা করো—

সেই সকাল থেকে স্নান করে নি—একটা দানা পর্যন্ত দাঁতে কাটেনি মীনাক্ষী।

নিজের ফ্ল্যাটে—শয়ন কক্ষে শয্যার 'পর উপুড় হয়ে পড়েছিল।

আয়া ঝুমকি এসে বললে, মেমসাহেব—ফার্গুসন সাহেব এসেছে—

কেন—কি চায়—এখন দেখা করতে পারব না বলে দে—

মিস্ রায়—

দরজার উপরে একেবারে ফার্গুসনের গলা শোনা গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে জমাট বেঁধে উঠেছে।

একি আলো জ্বালাও নি—What's the matter ? ফার্গুসনই সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল।

পার্থ এসেছে শুনলাম।

হ্যাঁ—তারপরই হঠাৎ বলে মীনাক্ষী, আমাকে এবার তোমরা মুক্তি দাও—

মুক্তি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি আর পারছি না—it has completely shattered my nerves—মুক্তি দাও—Let me go—

নিশ্চয়ই—মুক্তি তুমি পাবে বৈকি—যে রকম expect করছি—আর হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই—

না, না, না—আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী, একটা দিনও আর আমি পারছি না—একটা মুহূর্তও নয়—

Don't be sentimental—

না, না—আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও—

তাই কি হয়—When we are practically—আমাদের object—আমাদের destination-এ পৌঁছুতে চলেছি—সে সময় কি তোমাকে ছাড়তে পারি—

হ্যাঁ—হ্যাঁ—ছাড়তেই হবে—হয় তোমরা আমায় ছাড়ো—নচেৎ আমি—আমিই police-এ গিয়ে Surrender করবো—

সারেণ্ডার করবে—

Yes—করবো—

রাগে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে ততক্ষণে মীনাক্ষী—

জানো তার শাস্তি—হয় ফাঁসী না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—

তাই—তাই হোক—তবু যাবো—

আর তোমার পার্থ—যাকে তুমি মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছো আজ—তাকেও তাহলে তুমি মারতে চাও—You want to kill him.

না, না—পার্থ—পার্থ—পার্থর চোখে সে ছোট হতে পারবে না—মৃত্যুতে তার দুঃখ নেই—কিন্তু তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে হয় ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে পার্থ না হয় থুতু ছিটিয়ে দেবে—না, না—তা সে পারবে না। তারপর হয়ত সে ঘৃণায় লজ্জায় আত্মহত্যা করবে—উঃ মাগো—দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে মীনাক্ষী।

কান্নায় গুড়িয়ে যায়।

ফার্গুসন মৃদু হেসে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

দিন তিনেক বাদে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ হবে।

পার্থ তার ঘরের মধ্যে চুপটি করে বসেছিল। গ্রামোফন কম্পানীর লোকরা আজ তার কাছে এসেছিল।

অনেকদিন তার কোন গান রেকর্ড হয় না—এবারে তারা একটা পার্থর গান রেকর্ড করতে চায়।

পার্থ বলেছে করবে।

দামদস্তুরও হয়ে গিয়েছে।

তার ক্যামেলিয়ার লেখা গানটাই সে গাইবে—

তার ক্যামেলিয়ার লেখা গান—তার দেওয়া সুর—তার কণ্ঠ।

টুক্ টুক্—দরজায় মৃদু আঘাত।

কে ?

বাবুজী—আমি গুলজারী সিং—

আইয়ে—আইয়ে সিংজী—

পার্থ উঠে সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাতে যাচ্ছিল গুলজারী সিং বাধা দেয়, না বাবুজী আলো থাক—আলো চোখে আমার বড় লাগে—

চোখের অসুখ বুঝি ?

হ্যাঁ বাবুজী—প্রায় অন্ধ হয়ে এসেছি—

অন্ধ—

হ্যাঁ—আর হয়ত বেশী দিন দেখতে পাবো না এ দুনিয়া। সমস্ত আলো চোখ থেকে মুছে যাবে—

ডাক্তার দেখান না কেন ?

ডাক্তার কি করবে! ডাক্তারের সাধ্যের বাইরে এ রোগ—

তারপরই কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনাই।

তারপর পার্থ মৃদু কণ্ঠে বলে, আশ্চর্য—

কি আশ্চর্য বাবুজী—

গুলজারী সিং যেন চমকে ওঠে।

তোমার গলাটা সিংজী—পার্থ বলে।

আমার গলা!

হ্যাঁ—যেন ঠিক আমার অতি প্রিয়জনের গলার মত প্রথম দিন ষ্টেশনে তোমার গলা শুনে ত আমি চমকেই উঠেছিলাম—

বুকটার মধ্যে একটা অবরুদ্ধ হাহাকার—একটা চাপা কান্না যেন ঠেলে ঠেলে উপরের দিকে উঠতে থাকে মীনাক্ষীর।

অতি প্রিয়জন বললে, কে সে তোমার বাবুজী?

আমার ক্যামেলিয়া—মানে আমার ভাবী স্ত্রী—

ওঃ আচ্ছা বাবুজী—

কি সিংজী—

সেই লেড়কীকে তুমি বুঝি খুব ভালবাস?

হ্যাঁ—

খুব!

হ্যাঁ—সে যে আমার কতখানি সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না সিংজী—

খুব বিশ্বাসও কর তাকে, তাই না—

করি নিশ্চয়ই—

কিন্তু ধর বাবুজী—যদি কখনো শোন—

কি—

তার সব মিথ্যা—ফাঁকি—

সিংজী—গম্ভীর কণ্ঠে বাধা দেয় পার্থ গুলজারীকে।

হ্যাঁ—যদি শোন—সে তোমার বিশ্বাসেরও যোগ্য নয়—সে অতি সাধারণ—অতি নগণ্য—অতি—

থামুন—থামুন আপনি—

বাবুজী এই দুনিয়া বড় বিচিত্র—তার চাইতেও বিচিত্র বুঝি মানুষ,—মানুষের মন—

আপনি কি ঐ সব কথাই বলতে এসেছেন এখানে। তাই যদি এসে থাকেন ত—অনুগ্রহ করে এখুনি আপনি এখান থেকে চলে গেলে আমি খুশি হবো—

I am sorry. বাবুজী আচ্ছা আমি যাচ্ছি—নমস্তে—

পার্থ এত চটে গিয়েছিল যে প্রতি নমস্কারটুকুও জানায় না।

গুলজারী ঘর থেকে টলতে টলতে বের হয়ে যায়।

আর বের হয়েই মীনাক্ষী গলিপথটা অতিক্রম করে বড় রাস্তায় অপেক্ষমাণ তার গাড়িতে গিয়ে উঠে বসে।

গাড়ি ট্রাম রাস্তার কাছাকাছি এসেছেঃ হঠাৎ তার কানে এলো।

টেলিগ্রাফ বাবু—টেলিগ্রাফ—লড়াই শুরু হো গিয়া।

লড়াই শুরু হো গিয়া!

হঠাৎ যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে সমস্ত দেহটা অসাড় হয়ে যায় মীনাক্ষীর।

প্রাণপণে চিৎকার করে চলেছে হকারটা।

বহু লোক চার পাশে তার যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

লড়াই! আবার লড়াই!

আবার সেই ১৯৩৯ সাল!

আবার যুদ্ধ—আবার বোমা—আবার সেই সাইরেণ—

ড্রাইভারকে দিয়ে মীনাক্ষী একটা টেলিগ্রাফ আনিয়ে গাড়ির মধ্যে বসেই পড়তে লাগল : চীনেদের সৎ ইচ্ছার অবসান ঘটেছে।

পঞ্চশীল চুক্তি তারা ভঙ্গ করেছে।

চীনাদের পঞ্চাশ ডিভিশন সৈন্য অকস্মাৎ বিনা নোটিশে রাতারাতি ভারতবর্ষের বর্ডার গার্ড—সীমান্ত রক্ষীদের উপর বেয়োনেট গোলাগুলী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

নেফা—লাদাক—ভারতের পূর্ব-পশ্চিম সীমান্তের সবগুলো জায়গায় চায়না সহসা আক্রমণ করেছে।

সর্বনাশ!

এ যে একেবারে ঘরের দরজায় যুদ্ধ।

আসাম—নেফা থেকে আসামে আসতে কতক্ষণ—কটাই বা পাহাড় মাঝখানে।

পাহাড়গুলো পেরিয়ে আসাম—তারপরই তেজপুর—অর্থাৎ তার পরই একেবারে বাংলা দেশের সদর দরজা।

ঘরে ঢুকতেই দেখে ফার্গুসন ঘরের মধ্যে একটা সোফায় বসে।

মিঃ ফার্গুসন—

Who are you—সঙ্গে সঙ্গে ফার্গুসন উঠে দাঁড়ায়।

মুখের কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ খুলতে খুলতে ভ্রূকুটি করে মীনাক্ষী বলে, তুমি কতক্ষণ?

অনেকক্ষণ—তা প্রায় ঘণ্টাখানেক হবে। তারপরই একটু থেমে প্রশ্ন করে:

কিন্তু এ বেশ কেন!

প্রয়োজন ছিল—কিন্তু তুমি কেন এসেছো?

বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি—

কি, শুনি—

জরুরী এবং ভাল খবর আছে—

ভাল খবর।

হ্যাঁ শোননি তুমি—

কি?

যুদ্ধ বেধে গিয়েছে—China attack করেছে—এবারে আমাদের আসল কাজ—এতদিন ছিল প্রস্তুতি—now action.

বোবা বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মীনাক্ষী লোকটার মুখের দিকে।

ফার্গুসনের মুখের দিকে।

লোকটাকে এতদিন এ্যামেরিকান বলে মনে হয়েছে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা ত নয়—লোকটার মুখটা যেন অনেকটা মঙ্গোলিয়ান টাইপের।

ছড়ান চৌক চোয়াল—ভোঁতা নাক—ছোট ছোট চোখঃ অবিকল যেন মনে হচ্ছে একটা চীনাম্যান—

যে চীন আজ চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে অকস্মাৎ পঞ্চাশ ডিভিসন সৈন্য নিয়ে ভারতের সীমান্তরক্ষীদের 'পর রক্তলোলুপ নেকড়ের মত নখ বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সেই চীনেরই একজন ঐ লোকটা।

We must be always prepared—ready—ফ্ল্যাট থেকে এক মুহূর্তও তুমি কোথাও বের হয়ো না মিস রায়—আর একটা কথা—police কিছুদিন থেকে তোমার 'পরে নজর রেখেছে—

চ্যাপ্টামুখো চীনাম্যানটা যেন হলদে একসারি দাঁত বের করে হায়নার মত কুৎসিত হাসি হাসছে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে।

ও যেন পরিচিত ফার্গুসন নয় একটা হিংস্র জন্তু।

আচ্ছা চলি—খুব সাবধানে থাকবে। হাওয়া ভীষণ গরম—

মিঃ ফার্গুসন নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মীনাক্ষী পাথরের মত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু—জওহরলালজী দিল্লী থেকে বক্তৃতা দিলেন: What the chinese may have in mind in any-body's guess. We are at the cross roads of history and are facing great historical problems on which depends our future. We have to be big in mind, big in vision, and big in determination—

॥ ২১ ॥

ঘুম হয় না মীনাক্ষীর।

দু'চোখের পাতা থেকে ঘুম যেন একেবারে উবে গিয়েছে।

একটা অনুশোচনা—একটা ভয়াবহ অন্যায় বোধ—একটা বিষাক্ত অন্তর্জ্বালা যেন ওর সমস্ত অনুভূতি সমস্ত চেতনাকে নির্মম ভাবে যন্ত্রণা দেয়।

এই কয় মাসে কী করেছে মীনাক্ষী—

একটা ঘৃণ্য গুপ্তচর—ভারতের এক নাগরিক হয়ে ভারতের বিরুদ্ধেই সে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে হাত মিলিয়েছে, অর্থের লোভে—স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে নিজেকে বিক্রী করেছে।

এ কি করল সে—এ কি করল মীনাক্ষী।

ভারত আজ বিপদের সম্মুখীন—ভারতের দরজায় শত্রু হামলা দিয়ে পড়েছে।

চীন-ভারত ভাই ভাই নয়—চীন আজ মুখোশ খুলে ফেলেছে।

বেয়োনেট উঁচিয়ে ধরেছে।

সমস্ত দেশের টনক নড়ে ওঠে।

যুদ্ধ। যুদ্ধ—

আত্মরক্ষা করতে হবে—শুধু আত্মরক্ষাই নয়—দেশকে বাঁচাতে হবে—শত্রু আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে হবে।

we must fight, we must fight our enemies—

স্বেচ্ছাসেবিকাব ডাক পড়ে—সৈন্যদলে ডাক পড়ে—দাও টাকা দাও—যার যা আছে দাও—দু'হাতে দাও—রক্ত দাও—খাদ্য দাও—অর্থ দাও।

শিল্পীরা পর্যন্ত বসে থাকে না—তারাও দেশের যুদ্ধে প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সাহায্যের জন্য জলসা করে—অভিনয় করে—রাস্তায়

মাঠে মঞ্চ বেঁধে গান করে: দেশবাসী দাও—তোমার নিজের দেশ-মাতৃকার ইজ্জত—মা-বোনের ইজ্জত—বাপ-ভাইয়ের ইজ্জত আজ অতর্কিত চীনা আক্রমণে বিঘ্নিত।

চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়।

সকাল বেলা রেডিও খুললে গান শোনা যায়:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

হঠাৎ সেদিন রাত্রে—

নিজের ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চুপ চাপ রেডিওটা খুলে বসেছিল। আজ তার কাছে আর কোন সংবাদ নেই, কেবল যুদ্ধের সংবাদ।

শত্রু সৈন্য কতদূর এগুল।

যুদ্ধের আগুন কতদূর ছড়ালো।

হঠাৎ ঘোষণা শুনে চমকে ওঠে মীনাক্ষী।

ঘোষক বলে: আকাশবানী কলকাতা, এবারে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনাচ্ছেন কণ্ঠ-সংগীতের যাদুকর শিল্পী পার্থপ্রতীম চৌধুরী।

পার্থ গায়:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার॥

নিজের অজ্ঞাতে কখন যেন উঠে আসে মীনাক্ষী অন্ধকারে—যে টেবিলটার 'পরে রেডিওটা ছিল তার সামনে হাটু গেড়ে বসে রেডিওটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা কর—

পার্থ গাইছে ঃ

আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥

হতভাগিনী, এ তুই কি কবলি, কি করলি—এর চাইতে তুই বি
খেয়ে মরলি না কেন—

পার্লামেন্ট হাউসে রেজিলিউশন পাশ করা হলো : Th
House notes with deep gratitude this mightly upsurg
amongst all sections of our people for harnessing al
our resources towards this organisation of an all out
effort to meet this great national emergency.

প্রতিরক্ষা ফণ্ডে মুঠো মুঠো টাকা আসছে—মা-বোনেরা গা থে
গহনা খুলে দিচ্ছে—জোয়ানরা আর্মীতে যোগ দিচ্ছে—গা
রক্ত দিচ্ছে।

সব-সব কিছু, জামা-কাপড় টাকা কড়ি সব কিছু পাঠিয়ে দি
মীনাক্ষী প্রতিরক্ষা তহবিলে। তারপর ছুটে গেল মেডিকে
ক‍েজের ব্লাড ব্যাঙ্কে বললে, রক্ত নিন —আমি রক্ত দেবো—

ডাক্তার পরীক্ষা করে রক্ত নিলেন দেহ থেকে টেনে।

মীনাক্ষী বলে, অতটুকু নিলেন কেন—নিন—আরো নিন—

ডাক্তার বলেন, কিছু দিন পরে আবার আসবেন—

কেন এখনই নেওয়া যায় না।

না—একসঙ্গে ওর চাইতে বেশী রক্ত কারো শরীর থে‍ নেও
যায় না।

কিন্তু আমি পারব—আপনি নিন না—

না।

ফিরে এলো মীনাক্ষী। কিন্তু কি করে এখন সে। পার্থ
কি সব কথা লিখে জানাবে ?

না, না—তা আজ আর সম্ভব নয়—পার্থ তাকে বিশ্বাস করে না। করতে পারে না।

বলবে, তুমি—লোভী—তুমি নীচ—তুমি ভ্রষ্টা—দেশদ্রোহী—

গভীর রাত্রি।

একটা দুঃস্বপ্নের মত—একটা প্রেতের মত নিদ্রাহীন চোখে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল মীনাক্ষী।

বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু নক্ পড়ল—টুক্—টুক্—

কে?

Friend—দরজাটা খোল লায়লা—

মীনাক্ষী দরজা খুলে দিল। আর দরজা খুলে দিতেই মিঃ ফার্গুসন ঘরে এসে ঢুকল।

চিনতে পারে না অন্ধকারে ফার্গুসনকে—দুপা পেঁছিয়ে আসে মীনাক্ষী।

কে?

আলোটা জ্বালাতে যায় মীনাক্ষী। বাধা দেয় ফার্গুসন, না আলো জ্বেলো না—

ফার্গুসন—তুমি—

হ্যাঁ আমি—

What—what do you want? কি চাও তুমি—আর কি চাও তোমরা আমার কাছে—What more you want—

আস্তে চেঁচিও না—দেওয়ালেরও কান আছে—শোন—Front line-এ তোমাকে যেতে হবে—

Front line!

Yes—চুস্থুল ফ্রণ্টে যেতে হবে—কাল রাত্রে ট্রেন। তুমি যাবে একজন মিলিটারী নার্স হয়ে সেখানকার ফ্রণ্টের অস্থায়ী হাসপাতালে—

কিন্তু আমি—আমি নার্সিংয়ের কিছুইত জানি না—তাছাড়া—

কিছু জানতে হবে না তোমাকে—তাছাড়া মেয়েদের নার্সিং শিখতে হয় নাকি—এই নাও তোমার আইডেনটিটি কার্ড—hold it—

একটা খাম এগিয়ে দিল ফার্গুসন—

শিথিল হাতে ধরল খামটা মীনাক্ষী।

ফার্গুসন আর দাঁড়াল না—

ঠিক চোরের মতই মধ্যরাত্রির অন্ধকারে এসেছিল ফার্গুসন, আবার চোরের মতই যেন নিঃশব্দে বের হয়ে গেল মীনাক্ষীর ফ্ল্যাট থেকে।

মিঃ ফার্গুসনের সাবধানী রবার সোল দেওয়া জুতোর শব্দটা নিঃশব্দে যেন ঘরের বাইরে তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাইরে রাস্তায় শাদা রঙের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল।

ফার্গুসন এসে গাড়িতে উঠে বসল।

একটা গোঁ গোঁ শব্দ—অনেক উপরে মাথার 'পরে অন্ধকার আকাশে সাঁতরে চলেছে একটা প্লেন।

তার ডানার ত্থ'পাশে লাল নীল আলো ত্নটো জ্বলছে আর নিভছে।

অনেকক্ষণ—আরো অনেকক্ষণ পরে মীনাক্ষীর পাথরের মত দেহটা যেন অন্ধকারে নাড়াচাড়া করে।

আবার—আবার সেই খাম—মিথ্যা পরিচয়—কিন্তু এইত সুযোগ—হঠাৎ মনে হয়—অনায়াসেই সে ত এই মুহূর্তে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে।

কিন্তু তারপর—

কে তার কথা বিশ্বাস করবে। তার চাইতে সে যাবে সেখানে। এই সুযোগ।

এমন সুযোগ আর মিলবে না।

যে অন্যায় করেছে—যে পাপ করেছে—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবারে যদি ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে করতে পারে।

অনায়াসেই সে ফ্রন্ট লাইনে শত্রুপক্ষের শিবিরে হানা দিতে পারবে।

তার কাছে শত্রুপক্ষের সাংকেতিক চিহ্ন আছে।

সেই চিহ্নই তার পথ পরিষ্কার করে দেবে।

কিন্তু তার আগে—তার শেষ কর্তব্যটুকু—হ্যাঁ শেষ কর্তব্যটুকু পালন করতে হবে বৈকি।

আর দ্বিধা নয়—আর সংকোচ নয়—পার্থকে সব কথা এবারে জানিয়ে যেতেই হবে—

আর—আর শেষ বারের মত পার্থর সঙ্গে একবার দেখা। হ্যাঁ একবার দেখা করতে হবে।

একটিবার দূর থেকেও অন্তত তাকে না দেখে কেমন করে যাবে সে—

মীনাক্ষী সুইচ্ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাল।

তারপর কাগজ নিয়ে বসল—লিখতে হবে—চিঠি—শেষ চিঠি।

পার্থ, এই তোমাকে আমার শেষ চিঠি—কারণ এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই চিঠি লিখার সমস্ত প্রয়োজন আমার ফুরিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম—আমার দুঃখের কথা—আমার কলঙ্কের কথা—সব তোমায় জানিয়ে যাবো কিন্তু ভেবে দেখলাম তাতে আর কিই বা প্রয়োজন! যা গিয়েছে তাত আর আসবে না—আব তা ফিবে পাব না।

ফিরে পাবার সমস্ত পথই যে আমি নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি—তাছাড়া তোমার কাছ থেকে ঘৃণা সে আমি কেমন করে নেবো—যার কাছ থেকে শুধু ভালবাসাই পেয়েছি, তার কাছ থেকে ঘৃণা—না নো না—তার চাইতে এই ভালো—মুখ বুজে আমি চলে গেলাম; আমার দুঃখ, আমার লজ্জা—আমারই বুকের মধ্যে করে নিয়ে চলে গেলাম।

হ্যাঁ—আমি চললাম। আর একটা কথা: আমার আগের

চিঠিতে তোমায় জানিয়ে ছিলাম আমি হংকং গিয়েছি—সেটা মিথ্যা—তোমার সঙ্গে দেখাকরার মত সাহস সেদিন ছিল না বলেই দেখা করতে পারিনি। সেদিনকার সে মিথ্যার জন্যও ক্ষমা করে আমায়। বিদায় প্রিয়তম—

ভাগ্যে আমার ঘর নেই, তাই চলে যাচ্ছি।

জীবনে আর দেখা হবে না।

কিন্তু কোন দিন যদি শোন তোমার ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে—জেনো জীবনে সে তার চির আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লাভ করলো।

এবং সেই মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে যদি অন্তত এক ফোঁটা চোখের জল সেদিন ফেল, ত জানবে সেই হবে তোমার ক্যামেলিয়ার অক্ষয় স্বর্গ।

তার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হলো।

ইতি, তোমার ক্যামেলিয়া।

একটা খামের মধ্যে চিঠিটা ভরে খামটার মুখ বন্ধ করল ভাল করে।

রাত তখন ভোর হয়ে এসেছে।

॥ ১২ ॥

পরের দিন পার্থকে এসে একজন জানাল, মীনাক্ষী দেবীর এক বান্ধবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান—আজই সিঙ্গাপুর থেকে তিনি এসেছেন—আজই আবার রাত্রে ট্রেনে চলে যাবেন।

উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে পার্থ, কোথায়—কোথায় তিনি?

তিনি মিলিটারী নার্স—আজ রাত্রের কনভয়তে তিনি ট্রেনে আসাম যাবেন। সাড়ে বারটায় পার্ক ষ্ট্রীট ও ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন—সেখানে দেখা হবে—

রাত সাড়ে বারটা—

হ্যাঁ—সময় তো নেই—তাই যাবার পথে রাস্তায় দেখা করে যাবেন--

কেন ষ্টেশনে তো আমি যেতে পারি—

পারেন—কিন্তু সেখানে মিলিটারী পুলিশ কর্ডন থাকবে আপনাকে তো প্রবেশ করতে দেবে না সেখানে ঐ সময়—দেখাও করতে দেবে না—

বেশ—তাই যাবো তবে। তাকে বলবেন।

রাত ঠিক সাড়ে বারটা।

শীতের রাত : গত রাত থেকে কনকনে শীত পড়েছে।

নির্জন পার্ক ষ্ট্রীট, এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত শুধু রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে।

কোথায়ও একটি জনপ্রাণী বা যানবাহনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

গায়ে একটা ওভার কোট—মাথায় টুপি--নির্দিষ্ট জায়গায় মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পার্থ।

উদ্‌গ্রীব চক্ষু তার একবার এদিক ওদিক রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাচ্ছে।

কেউ নেই কোথাও।

সত্যিই ক্যামেলিরার বান্ধবী তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে, না বাজে ধাপ্পা—

ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায় পার্থ।

অন্ধকারে এক জোড়া জোরালো হেড লাইটের আলো অনেক দূরে দেখা গেল।

আলোটা আসছে, এগিয়ে আসছে।

পার্থ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

বিরাট একটা পাইথনের মত শাদা গাড়িটা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে রাস্তার আলো পর্যাপ্ত না পড়ায় আবছা আবছা একটা আলো-আঁধারী।

পার্থ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে কে যেন বসে।

পার্থ বাবু?—

আবার সেই কণ্ঠস্বর চম্‌কে ওঠে।

কে?

পার্থ বাবু—এই চিঠিটা মীনাক্ষী আপনাকে দেবার জন্য আমাকে দিয়ে গেছেন বলতে বলতে জানালা পথে একটা হাত বের হয়ে এলো—একটা শাদা খাম।

কেমন যেন বোকার মতই খামটা হাত বাড়িয়ে নেয় পার্থ।

গাড়িটা ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে—

ছুটতে ছুটতে গাড়ির সঙ্গে চলে পার্থ, শুনুন—শুনুন—সে—মীনাক্ষী কবে আসবে—

সে-ই আপনাকে চিঠিতে জানাবে। যান, ঠাণ্ডা লাগাবেন না আর—

গাড়িটা অতঃপর স্পীড দেয়—সোঁ করে যেন এগিয়ে যায়। আর চকিতে সেই সময় সেই মুহূর্তে যেন কি মনে হয় পার্থর। সে চিৎকার করে ওঠে—ক্যামেলি—ক্যামেলিয়া—

গাড়ির পিছনের লাল আলো দুটো বহুদূরে অন্ধকারে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে গেল।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে পার্থ।

শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে রাত সোয়া একটা—মিলিটারী স্পেশাল ছাড়ছে—

নিঃশব্দে সৈন্যরা—নওজোয়ানেরা মার্চ করে মিলিটারী স্পেশাল ট্রেনে উঠছে।

পরনে বটলগ্রীন মিলিটারী ড্রেস—ব্যাটল স্যুট্—মাথায় লোহার হেলমেট—পিঠে হ্যাভার স্যাক—কাঁধে ছুঁচালো বেয়োনেট রাইফেল।

পায়ে ভারী এ্যামুনিশন বুট।

চল জোয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে—অনেক দুঃখের—অনেক অশ্রু—অনেক বেদনার স্বাধীনতা আমাদের, তাকে কি আমরা হারাতে পারি?

কদম কদম বাঢ়ায়ে যা।

খুশি কি গীত গায়ে যা—

চল—চলরে নওজোয়ান।

আর চলেছে একটা হসপিটাল ইউনিট—সেই ইউনিটের মধ্যে সিস্টার মার্গারেট—সিস্টার মার্গারেটের পরিচয়ে মীনাক্ষী।

পরনে তারও মিলিটারী ইউনিফর্ম।

এক সময় ট্রেন ছাড়ল।

চায়নীজ আর্মী আসছে। এগিয়ে আসছে আরো—আরো কাছে।

ওয়ালং, বমডিলা, তেজপুর।

বমডিলার পতন হয়েছে।

প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো শীত—পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শাদা

তুষারের কিরীট।...তারই মধ্যে নওজোয়ানরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে।

তেজপুর এভাকুয়েশনের অর্ডার হয়ে গিয়েছে।...

...ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আতংক। তারা ক্রমশঃ হটে চলেছে।

চায়নীজ সোলজারদের দুর্ধর্ষ আক্রমণে তারা পর্যুদস্ত।

ভারতীয় সৈন্যদের মরাল রাখা চাই। তাদের সাহস উদ্দীপনা আনন্দ দিতে হবে।

একদল শিল্পী চলেছে ফ্রন্ট লাইনে—গান গেয়ে কৌতুক করে সৈনিকদের উৎসাহ দিতে হবে—সাহস দিতে হবে।

পার্থপ্রতীম সেই দলে নাম লেখাল।

সেও যাবে ফ্রণ্টে।

সে রাত্রে গৃহে ফিরে এসে প্রথমেই খামটা ছিড়ে ফেলে চিঠিটা পড়ে পার্থ।

কিন্তু মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না চিঠিটা পড়ে। চিঠির ঐ সব কথার অর্থ কি!

ঐ সব কথা ক্যামেলিয়া চিঠিতে তাকে কেন লিখেছে। কিসের তার কলঙ্ক—কিসের জন্যই বা লজ্জা—আর কেনই বা সে এমন একটা অদ্ভুত চিঠি লিখে তাকে চলে গেল এমনি করে।

মনে পড়ে ইদানীং কেমন যেন চিঠির ভাষা সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে ছিল ক্যামেলিয়ার—একটা দুটোর বেশী কথা নয়।

সেও নেহাৎ কর্তব্যের কথা।

কোন প্রাণের সাড়া তার মধ্যে নেই যেন।

তারপর এই যে এতদিন পরে সে ফিরে এলো অথচ সে তার সঙ্গে একটিবার দেখা পর্যন্ত করল না, এখানেও যেন সংশয়—

এতদিন যে সংশয়টা দেখা দেয় নি আজ গত কয়েক মাসের অনেক ছোটখাটো ঘটনা মনের পাতায় ভেসে ওঠে পার্থর।

একটা সংশয়—একটা সন্দেহ—স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একটা বিশ্রী সন্দেহের কাঁটা মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে কেবল্‌ই বিঁধছে যেন।

কেবলই মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা গোলমাল আছে।

কিন্তু ভেবে কিছুই কুলকিনারা করতে পারছে না পার্থ।

বার বার চিঠিটা পড়ে কিন্তু তবু কিছুই যেন স্পষ্ট হয় না।

কটা দিন ঐ ভাবেই একটা চিন্তার মধ্যে কেটে গেল।

এমন সময় এলো আনন্দ পরিবেশনের জন্য শিল্পীদের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির থেকে ডাক।

পার্থ এগিয়ে গেল।

সে গাইবে।

দেশের চারণ কবি গাইবে সে।

বলবে ভয় নেই—তোমরা অবশ্যই জিতবে। দেশ জননীর মুখোজ্জল তোমরা নিশ্চয়ই করবে।

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥
দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার।

একেবারে ফ্রন্ট্‌ লাইন থেকে কিছু দূরে সি, সি, এস—ক্যাসুলটি ক্লিয়ারিং ষ্টেশন বা অস্থায়ী হাসপাতাল।

শহরের সীনানা দূরে।

পাকা বাড়ি নয় তাবু খাটিয়ে হাসপাতাল।

ট্রেনে উঠেই মীনাক্ষী তার আইডেনটিটি কার্ডটা খাম থেকে বের করে দেখতে গিয়ে খামের ভিতরে তার পোস্টিং অর্ডারটা পায়।

আর্মী হেডকোয়ার্টার থেকে পোস্টিং অর্ডার—১৯নং সি. সি. এস য়ে।

কবে তার ইণ্টারভিউ হলো—কবেই বা সিলেকশন হলো আর কোথাই বা তার নার্সিংয়ের ট্রেনিং হলো।

আশ্চর্য লোকগুলোর কেরামতী—সব কেমন সুন্দর গুছিয়ে করেছে—নিখুঁত ভাবে করেছে। সে এখন একজন পাকাপোক্ত মিলিটারী নার্স।

মিস্ লায়লাবানু।

দুটো দিন ধরে ট্রেনে—স্টীমারে—ট্রাকে কেমন করে যে সে এসে নির্দিষ্ট হাসপাতালে পৌছাল নিজেই তা জানে না।

একটা স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন সব কিছু ঘটে গেল।

সে রাত্রে পার্থর সেই ডাকটা যেন এখনো কানে এসে বাজে।

নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত চিনতে পেরেছিল তাকে সে। নচেৎ 'ক্যামেলিয়া' নামে অমন চিৎকার করে পিছু থেকে ডাকত না তাকে।

ক্যামেলিয়া।

ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে পার্থ। তোমার ক্যামেলিয়ার মৃত্যু হয়েছে।

সেবা কোন দিন করে নি মীণাক্ষী—কিন্তু মেয়েত সে—মেয়ে জাতকে কি সেবা শেখাতে হয়, সেবা যে তার রক্তের মধ্যে।

তাছাড়া সেবার হাতে খড়িত তার আগেই হয়ে গিয়েছে। সেই পার্থকে যখন সে সেবা করত।

ঠাট্টা করে পার্থ বলেছিল একদিন, তুমি নার্সিংয়ের ট্রেনিং কখনো নিয়ে ছিলে নাকি ক্যামেলি—

কেন বলত!

নইলে এমন করে সেবা কর কি করে?

তুমি একটি নীরেট—

কেন!

তা নয়ত কি—মেয়েদের সেবার ট্রেনিং আবার কখন নিতে হয় নাকি!

হয় না বুঝি!

না গো না—

আজ আহতদের সেবা করতে করতে সেই কথাটাই বুঝি বার বার মনে হয় মীনাক্ষীর।

তবু ভাল তাকে এখানে এনে ওরা স্পাইংয়ের কাজে ঠেলে না দিয়ে সেবার মধ্যে নিযুক্ত করেছে।

সারাটা রাত ঘুমায় না মীনাক্ষী।

আহতের বেডে বেডে ঘুরে বেড়ায়।

কি হলো ঘুম হচ্ছে না বুঝি!

না!

চোখটা বোজো—আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই—

মাথায় হাত বুলাতে থাকে মীণাক্ষী।

রোগীর দু চোখে ঘুম নামে।

কারো পা গেছে—কারবা হাত গেছে—কিন্তু আশ্চর্য, কারো যেন কোন দুঃখ নেই, স্বাধীন দেশের সৈনিক—

তাদের সেই গর্ব যেন দৈহিক সমস্ত যাতনাকে সুস্থতা দিয়েছে।

মাঝখানে একদিন প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী এলেন—

সবাই চেঁচিয়ে ওঠে—পণ্ডিতজী জিন্দাবাদ—

পণ্ডিতজী বলেন, না ভাইয়ো, বলো জয় হিন্দ্—

জয় হিন্দ্—

॥ ২৩ ॥

সেদিন নিজের তাবুতে সবে এসে প্রবেশ করেছে কাজ শেষে মীনাক্ষী—ধরা চূড়াগুলো তখনো গা হতে নামায় নি— নজরে পড়ল, একটা চিঠির খাম পড়ে আছে সামনের টেবিলে।

কে চিঠি দিল—

পার্থ—না পার্থ জানবে কি করে তার ঠিকানা।

তবে কে!

তবে কি—কম্পিত হাতে খামটা ছিড়ে ফেলল মীনাক্ষী—হ্যাঁ—যা ভেবেছিল তাই—সংক্ষিপ্ত চিঠি –

সামনের বুধবার রাত্রে—দশটার পর ২৮ নং ক্যাম্পে যাবে—পেরিমিটার থেকে এক মাইল দূরে।

পাস ওয়ার্ড—ইয়াংসিকিয়াং—রাস্তার ম্যাপ— নীচে আঁকা রইল।

সংবাদ চাই—

ব্যস্ আর কিছু না।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ চিঠিটা হাতে করে যেন পাথরের মত বসে থাকে মীনাক্ষী।

যেতে হবে—যেতে হবে বৈকি।

যাবে সে।

বুধবার মানে—কাল বাদে পরশুইত।

রাত দশটার পর!

আশ্চর্য—সেদিন মীনাক্ষীর অফ্ ডিউটি।

মনে মনে তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ছকে ফেলে মীনাক্ষী। কি করবে অতঃপর স্থির করে ফেলে।

আর দ্বিধা নয়—আর সংকোচ নয়।

যে পাপ সে করেছে—যে অপরাধ সে করেছে তার কিছুটা অন্তত যদি মূল্য শোধ করে যেতে পারে সে—

হে ভগবান—শক্তি দাও।

সাহস দাও।

অন্ধকার রাত—

তবু একটা কালো কম্বলে আপাদ-মস্তক আবৃত করে বের হলো মীনাক্ষী তার তাঁবু থেকে।

পাশেই জঙ্গল।

সেই দিকে এগিয়ে চলে।

হিমেল বাতাস পাহাড়ের চূড়া . চূড়ায় তুষারেব কণা মেখে নিয়ে যেন চাবুক হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলের গা ঘেঁষে পাহাড়।

পাহাড়ের মধ্যে সরু গিরিবর্ত্ম।

দু'পাশে খাড়া উঁচু পাহাড়, আর ঘন জংগল।

তার মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসছে মীনাক্ষী—চীনাদের শিবিরে সে গত রাত্রে গিয়েছিল, অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছে—ফিরে গিয়ে ইন্‌ডিয়ান আর্মীর কমাণ্ডেণ্ট—মেজর জেনারেলকে দিতে হবে।

তারপর তার ছুটি।

প্রশ্ন উঠবেই কেমন করে সে চীনা যুদ্ধ শিবির থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনল—অকপটে তখন সে সব কথা স্বীকার করবে।

বলবে—অপরাধী—দেশদ্রোহিনী আমি—আমার প্রাণদণ্ড দাও—

হাত পা ছিঁড়ে গিয়াছে—ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। আর বুঝি পারে না মীনাক্ষী।

ভারতীয় সীমানা শিবির আর কতদূর—

পারবে না!কি—মীনাক্ষী পৌঁছাতে পারবে নাকি সেখানে?

পারবে—পারতে তাকে যে হবেই।

যুদ্ধ-শিবিরে গানের আসরের শেষে এখন কৌতুক পরিবেশনের পালা শুরু হয়েছে।

ব্যাপারটা হঠাৎই ঘটেছিল।

হাসপাতালের ইউনিটের একটা গ্রুপ্ ছবি ফৌজী সংবাদ পত্রে বের হয়েছিল—

তার মধ্যে—মিলিটারী নার্সের বেশে মীমাক্ষীকে দেখে চম্‌কে ওঠে পার্থ।

মীনাক্ষী—নিশ্চয়ই সেই।

একবার মনে হয়েছিল মীনাক্ষী মিলিটারী নার্স কি করে হবে—কিন্তু ফটোর আশ্চর্য সাদৃশ্য—সেই সাদৃশ্যই মনের কৌতূহলকে তার তীব্র করে তোলে। এ সন্দেহের অবসানের দরকার।

এবং তখনই সে মনে মনে স্থির করে অগ্রগামী কিছু দূর অবস্থিত ক্যামুলটি ক্লিয়ারিং সেণ্টার হাসপাতালে সে একবার যেমন করে হোক যাবেই।

কয়দিন ধরে সেই সুযোগের আশায় ছিল পার্থ এখানে আসাঅবধি কিন্তু সুযোগ পায় নি।

সামনের দিকে—ফ্রন্ট্ লাইনের দিকে যাওয়াও একেবারে নিষেধ—

কড়া পাহাড়া—

কিন্তু আজ সেই সুযোগ মিলে গেল যেন পার্থর।

সবাই আমোদের আসরে ব্যস্ত—

সেই ফাঁকে পার্থ বের হয়ে পড়ল শিবির থেকে সবার অলক্ষ্যে।

সামনের ক্যাসুলটি ক্লিয়ারিং হাসপাতালে সে আজ হানা দেবেই স্থির করেছে।

খোঁজখবর নিয়ে জেনেছিল—বেশী দূরের পথ নয়—মাত্র মাইল তিনেক পথ।

পার্থর স্থির ধারণা সেই হাসপাতালে গেলেই মীনাক্ষীর সন্ধান পাবে সে।

কারণ—গ্রুপ ফটোর মধ্যে সেই নার্স—আর কেউ নয়—মীনাক্ষীই। নচেৎ অমন আশ্চর্য মিল চেহারার হয় কি করে। তার চোখে আর সে ধূলো দিতে পারবে না।

কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলল অন্ধকারে পার্থ।

পাহাড় জংগলা পথে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারে অন্য পথে গিয়ে পড়ল।

উঃ কি অন্ধকার—আর কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ভুল পথে এগুতে এগুতে চাইনীজ পেরিমিটার পার হয়ে পার্থ চায়নীজ এক রেকি পার্টির মুখোমুখী পড়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে চাইনীজ রেকি পার্টি গুলী চালায়।

গুলিবিদ্ধ পার্থ একটা আর্ত যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে···

ইন্‌ডিয়ান পেরিমিটারে প্রবেশ করতে গিয়ে বাধা পায় মীনাক্ষী অন্য প্রান্তে।

সেন্ট্রী চ্যালেঞ্জ করে, হল্ট্—

ফ্রেণ্ডস্—থমকে দাঁড়ায় মীনাক্ষী।

সেন্ট্রী এগিয়ে আসে রাইফেল নিয়ে—মীনাক্ষীর পরনে পুরুষ সিভিলিয়ান পোশাক।

সেন্ট্রীর সন্দেহ হয় সে তাকে সোজা নিয়ে গিয়ে কম্পানী কমাণ্ডারের তাঁবুতে হাজির করে।

কর্ণেল চোপরা বের হয়ে এলো, কি ব্যাপার গুরুমুখ—

এই—এই জেনানা পুরুষের বেশে আমাদের পেরিমিটারে ঢুকছিল—

তাঁবুর আলোটা বাড়িয়ে দেয় কমাণ্ডার চোপরা।

মেয়ের মতই ঘর বাঁধতে চেয়েছিলাম। স্বামী পুত্র-নিয়ে একটি সুখের সংসার গড়তে চেয়েছিলাম—

and you did it—

হ্যাঁ—একটি মানুষকে ভালবেসেছিলাম—সেও আমায় ভালবেসেছিল। দু'জনে ঘর বাঁধব এমন সময় হলো তার টি, বি—তার গলা দিয়ে রক্ত পড়লো—

May I come in Sir—

বাইরে থেকে জমাদার পাণ্ডের গলা শোনা গেল।

Yes—আইয়ে জমাদার সাব্—

জমাদার পাণ্ডে ভিতরে প্রবেশ করে জুতোর ক্লিক্ করে কর্ণেলকে স্যালুট দিল।

কেয়া হ্যায় জমাদার সাব্—

এক বাংগালীবাবু কর্ণেল সাব্।

বাংগালী বাবু—yon mean civilian!

হ্যাঁ—আমাদের পেরিমিটারের বাইরে তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে—সম্ভবতঃ চীনা রেকি পার্টির গুলীতে সে নিহত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হয়ে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের ঢালু পথে আমাদের পেরিমিটারের মধ্যে এসে পড়ে—

কোথায় সে—

ডেড বডি বাইরে ষ্ট্রেচারে আছে—

কই চলত দেখি—না থাক তাঁবুর মধ্যেই নিয়ে এসো।

ষ্ট্রেচারটা তাঁবুর মধ্যে আনা হলো।

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ।

লাইটটা তুলে ধরে জমাদার পাণ্ডে—বুকের মাঝখানে ঠিক গুলী লেগেছে।

আলোটা মৃতের মুখের সামনে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে ওঠে মীনাক্ষী—

পার্থ—

চমকে কর্ণেল ফিরে তাকায় মীনাক্ষীর দিকে।

মীনাক্ষীর সর্বশরীর তখন থরথর করে কাঁপছে—সে অস্ফুটে বলে, না—না, না–না–না–

তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁবুর মধ্যে এসে ঢোকে।

॥ ২৫ ॥

মিলিটারী কোর্ট মার্শাল।

এসপিয়নেজ—স্পায়িং—দেশের বিরুদ্ধে জাতির বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতাই।

অতএব চরম দণ্ড।

বিচার চললো—দণ্ডাদেশও ঘোষিত হলো।

কিন্তু মীনাক্ষী সেই যে মুখ বন্ধ করেছে আর মুখ খোলে নি।

যেন পাথর হয়ে গিয়েছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মিলিটারী ভ্যান এসে দাঁড়িয়েছে বন্দিনীকে নিয়ে যাবে তেজপুরে—

কোয়ার্টার গার্ডে এসে ঢুকল কর্ণেল চোপরা।

একটা খাটিয়ার উপর বসে কে ও।

জীর্ণ শীর্ণ।

সমস্ত মাথার চুল শ্বেত শুভ্র।

ঐ কি মাত্র কুড়ি দিন আগেকার সেই যুবতী নারী মীনাক্ষী?

মীনাক্ষী রায়।

মিলিটারী গার্ড বললে, ওঠো—চল—

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় মীনাক্ষী—শূন্য অসহায় দৃষ্টি।

চলো—

অশীতিপর এক বৃদ্ধা যেন ক্লান্ত শ্লথ পায়ে এগিয়ে চলে অদূরে দণ্ডায়মান কালো মিলিটারী ভ্যানটার দিকে।

দু'পাশে হেঁটে চলে দু'জন রাইফেলধারী প্রহরী।

তাদের ভারী এ্যমুনিশন বুটের আওয়াজে শোনা যায় মচ্—মচ্—মচ্—

দিনের শেষ আলোটুকু নেফার আকাশ থেকে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আর একটু পরেই দেখা দেবে সন্ধ্যাতারাটি আকাশের প্রান্তে।

একক নিঃসঙ্গ করুণ বিষণ্ণ সন্ধ্যাতারাটি।

সৈন্য শিবিরে বিউগল বাজছে।

—তারপর? ওঠালাম আমি—

কিন্তু কারাগারে নিয়ে যাওয়া আর হলো না তাকে, ডাক্তার বন্ধু বলে।

কেন।

কারণ তখন সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ—ডাক্তারদের পরামর্শে তাকে এখানেই পাঠিয়ে দিল সরকার। সেই থেকে ও এখানেই আছে—। তিন মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় ওর মুখে কথা ফুটল—এবং প্রথম কথাটি ফুটলো—

কি।

ও বললে, ওর নাম ক্যামেলিয়া—

॥ শেষ ॥